

জিতেন্দ্রকুমার লাহিড়ী

শ্রীচরণেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

চিত্র ও বিচিত্র

বসন্ত কেবিন

নব বৃন্দাবন

অন্ত ও প্রত্যহ

বার্ধক্যে বারাণসী

একটি অশ্রু দুটি রাত্রি
ও কয়েকটি গোলাপ

॥ এক ॥

কথাটা ঘরের মধ্যে কাটা পাঁঠার মতো তখনও ছটফট করছিল।

রংপুরহাটের সাড়ে তিন আনির ছোট তরফ সূর্যকান্ত দেব কলকাতার বাসাবাটির বৈঠকখানায় পরিত্যক্ত নলে আবার ওষ্ঠ সংযুক্ত করলেন। মুখের ওপর দিয়ে স্পাইর্যাল সিঁড়ির মতো ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল ধোঁয়া; ঈষৎ নীল তার রং। পুরাতন ভৃত্য অনন্ত পাত্র পালটে দিয়ে গেল কল্কে। ঘরখানা গন্ধমাতাল হয়ে উঠলো আবার মুহূর্তে। সেই আশ্চর্য সুরভিযুক্ত বালাখানা জলের মধ্যে মোটরযানের শব্দ করতে করতে শূন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরে, সিলিঙে, জানালায়; সূর্যকান্তর বসবার আরাম-কেদারার উল্টোদিকে উপবিষ্ট অভ্যাগতদের মুখের ওপরেই অশিষ্ট ভঙ্গীতে। নির্বাক সেই অতিথিরা সংখ্যায় পাঁচজন। সূর্যকান্তর শেষ কথাটার পর নিরুত্তর হওয়া ছাড়া তাদের উপায়ই বা কি ছিল আর। ঘরের মধ্যে দেওয়াল-ঘড়ির টিক্ টিক্ সঙ্গত করছিল শুধু বালাখানার জলকণ্ঠে উচ্চারিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে।

সূর্যকান্ত আরক্ত নয়নে তাকালেন পঞ্চপাণ্ডবের দিকে। ইঙ্গিত বুঝতে দেরী হলো না তাঁদের; উঠে পড়লেন তাঁরা সবাই একসঙ্গে। কথা বলেন কম সূর্যকান্ত; সেই কথাও বলা হয়ে গেলে প্রতিপক্ষের আর একটি কথাও শুনতে চান না তিনি। এমন কি উপস্থিত পক্ষকে উঠে যেতে বলবার জন্যে আর একটি অতিরিক্ত বাক্য ব্যয়ও অপব্যয় মনে করেন, প্রয়োজনীয় খরচার বেশি আর একটি কপর্দকও ট্যাঁক থেকে প্রাণ থাকতে খসাতে রাজি হয় না কিছুতেই

যেমন কৃপণ, তেমনই ; চোখের ইশারাতেই অনুক্ত অধ্যায় উক্ত হয় এমন স্পষ্ট, এমন সহজ, এমন অদ্ব্যর্থক ভাষায় যে তারপর আর পাথরে তৈরী না হলে বসে থাকা প্রায় অসম্ভব। আজকেও সূর্যকান্তর চোখে তাঁর মনের পাণ্ডুলিপি পড়তে দেরী হলো না যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের বিন্দুমাত্র। বেরিয়ে যাবার আগে নমস্কার করবার কারণে দুই কর যুক্ত করলেন তাঁরা ; রংপুরহাটের সাড়ে তিন আনির ছোট তরফ সূর্যকান্ত দেব তা গ্রাহ্য করলেন কিনা বোঝা গেল না। যেমন গড়গড়া টানছিলেন তেমনই টেনে চললেন আওয়াজ করে। আর ইঞ্জিনের আকাশমুখী চিমনি দিয়ে যেমন একরাশ ধোঁয়া উঠে কালো করে দেয় চারপাশ মুহূর্তে, তেমনই পাঁচ নমস্কারের প্রত্যুত্তরে উদ্গীরণ করলেন নাক-মুখ দিয়ে এক পাহাড় ধোঁয়া ; ঘরখানা ভরে গেল বালাখানায়। ধোঁয়ার জালের আড়ালে সূর্যকান্তর মুখখানা দেখাতে লাগল 'রক্তকরবী'র রাজার মতো থমথম করছে।

বাইরে ততক্ষণে জব চার্ণকের প্রিয় এই শহরের আকাশে ঝড় উঠেছে—সাংঘাতিক ঝড়।

সেই ঝড় নিজেকে ছড়াতে ছড়াতে বাড়াতে বাড়াতে গিয়ে পৌঁছল অতি অল্প কয়েক মুহূর্তের রণপায় লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে টালিগঞ্জের প্রত্যন্ত প্রদেশে। টালিগঞ্জের বাস টার্মিনাস থেকেও যা সাইকেল রিক্সায় বারো আনার এবং পায়ে হেঁটে পঁচিশ মিনিটের পথ। যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে রামকৃষ্ণ কলোনী, সেই কলোনী শুরু হবার একটু আগেই একখানা একতলা ভাঙা বাড়িতে এই ঝড়ের মুখেই খবর গিয়ে পৌঁছল যে, ললিতার বিয়ে এবারেও হবে না। এবারও, এই পঞ্চমবারও তার বিবাহের পূর্বে পাকা দেখার দিন পাকা করতে গিয়ে ভেঙে গেছে। খবরটা শুনে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা অথবা হতাশা বা ক্রোধ কিছুই প্রকাশ করে নি রামকৃষ্ণ কলোনী শুরু হবার একটু আগেই এই একতলা একখানা

ভাঙা বাড়ি। একই রোগে সন্তানের পর সন্তানের মৃত্যুতে পাষাণ পিতামাতা যেমন আরেক সন্তানের সেই একই অসুখের পুনরাবর্তনের খবর পেলে আর আশ্চর্য হন না তেমনই ললিতার একই রকমে পঞ্চমবার এই বিবাহ-সম্ভাবনা ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ায় যেমন চলছিল সব তেমনই যতটুকু জীবিত তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি মৃত এই বাড়ি চলতে লাগল ঘড়ির মতো প্রাণহীন নিয়মে।

কেবল এবারের পাত্রপক্ষ ছিলেন রংপুরহাটের সাড়ে তিন আনির ছোট তরফ। তাঁর ছেলের সঙ্গে ললিতার বিয়েটা হলে আগের চারবার বিয়ে ভেঙে যাবার অর্থ হাতড়াতে হত না বেশী দূর। হাতের কাছেই মজুদ, অসহায় মধ্যবিত্তদের সেই—'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন' এই সান্ত্বনার মানে খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু এবারও অমঙ্গল ঘটায় আর সব অমঙ্গলের মধ্যেই মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে ভাবার মতোও মনের অবস্থা রইলো না ললিতার বাবা-মায়ের, না আর কারুর।

ললিতার নিজের কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। সে শুধু মেয়ে নয়, চাকরি করা মেয়ে। তার মাইনের টাকাকটার ওপরেই এ সংসারের চাকা ঘোরে। তবুও তার বিবাহের জন্যে মা-বাবার, বাড়ির অন্যান্যদের এবং পাড়ার শুভানুধ্যায়ীদের এত মাথাব্যথার মানে সে বোঝে না। বুঝবার চেষ্টা করলে, কালিদাসের সেই, যে ডালে বসে থাকা সেই ডালই কাটার, সীমাহীন নির্বুদ্ধিতার কিংবদন্তীর কথাই কেবল বার বার মনে পড়ে।

সূর্যকান্তর চোখ বুজে গড়গড়া টানা থেমে গেল চন্দ্রকান্তর কথায়। সূর্যকান্তর ঘর থেকে কন্যাপক্ষের পাঁচজন প্রস্থান করা মাত্র রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে দেরী করে নি চন্দ্রকান্ত দেব,—সূর্যকান্তর একমাত্র বংশধর; রংপুরহাটের সাড়ে তিন আনি ছোট তরফের 'সাত রাজার ধন এক মাণিক'। ঘরে ঢুকেই গড়গড় করে

বলতে শুরু করেছিল তার পার্ট ; যেন নাটকের সংলাপ বলছে সে দীর্ঘদিন ধরে মহলা দেবার ফলে প্রম্প্‌টারের সাহায্য ছাড়াই : বাবা, তুমি নাকি এই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিবাহে না করেছ কি একখানা বাজে উড়ো চিঠির কথায় কান ভারি করে ? সূর্যকান্ত সুখনিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন। ধড়মড় করে জেগে উঠলেন না কিন্তু। আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুললেন : বাজে চিঠি তোমাকে কে বললে ? চন্দ্রকান্ত সূর্যকান্তর চেয়েও দ্রুত ফিরিয়ে দিলেন সার্ভিস : উড়ো চিঠি মানেই বাজে চিঠি। যে চিঠির তলায় লেখক তার স্বাক্ষর দিতে ভয় পায়, বিলেতে সে চিঠি কেউ পড়েই না ; অ্যানোনিমাস্‌ লেটার পাওয়া মাত্তর ছিঁড়ে ফেলে দেয়। সূর্যকান্ত আবার চোখ বুজলেন ; চোখ বন্ধ রেখেই উত্তর দিলেন : বিলেত হলে আমিও তাই করতাম—কিন্তু,—চন্দ্রকান্ত নাছোড়বান্দা : কিন্তু মেয়েটি সত্যি অপরাধী কি না তার বিচার না করেই এই 'না' করে দেওয়া রংপুরহাট সাড়ে তিন আনি ছোট তরফের বিচার নয় বাবা।

সূর্যকান্ত সোজা হয়ে বসলেন। গড়গড়ার নল মুঠোমুক্ত করলেন। চাকরকে চোখের ইশারায় স্নানের আগের প্রাত্যহিক তৈল মর্দনের নির্দেশ দিলেন। তারপর যিনি কথা বললেন তিনি প্রতি করুণায় বিগলিত কিং লিয়ার নন, তিনি হচ্ছেন—রংপুরহাটে দিনদুপুরে যাঁর আদেশে 'বলদে' 'বাঘকে' হত্যা করে ঝুলিয়ে দিয়েছে রাস্তার গাছে, সেই নিষ্ঠুর দোর্দণ্ডপ্রতাপ সূর্যকান্ত দেব। তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষ্যাপা ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল এবার স্তব্ধ ঘরের একফালি বেলাভূমিতে : তুমি অকারণে উত্তেজিত হচ্ছ চন্দ্রকান্ত ; আমি ওদের বলেছি যে, মেয়েটির সম্পর্কে এই উড়ো চিঠিটা যে একদম ভিত্তিহীন তার এতটুকু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যদি কেউ দিতে পারে তাহলে এ মেয়েকে ঘরের বউ করে আনতে আমার আপত্তি নেই।

চন্দ্রকান্ত ঘর থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়ালো। চন্দ্রকান্ত জানে এরপর আর একটি টুঁ শব্দ করবার চেষ্টা করলেও আর রক্ষে নেই। ক্ষ্যাপা ঢেউ সীমানা অতিক্রম করবে তৎক্ষণাৎ। যে ক্ষীণ আশার রূপালী রেখা দেখা দিয়েছে সূর্যকান্তর আপত্তির কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডলে তা এক ফুৎকারেই একেবারেই নির্বাপিত হবে। অতএব প্রস্থান করাই এখন সবচেয়ে সুবিধার মনে করে চন্দ্রকান্ত পা বাড়াতেই সূর্যকান্তর নিরুত্তেজ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো: শোন; লাইব্রেরী থেকে ডি. এল. রায়ের 'হাসির গান'-খানার যে পাতায় 'বিলেত দেশটা মাটির সেটা সোনা-রূপোর নয়' গানটা রয়েছে সেই জায়গাটা বার করে দিয়ে যাও তো। আরেকবার পড়ব।

ইঙ্গিতটা বুঝলো চন্দ্রকান্ত। সূর্য-প্রতিফলিত চন্দ্রমুখ ইঙ্গিতটা বুঝতেই টকটকে লাল হয়ে উঠলো।

টালিগঞ্জের রামকৃষ্ণ কলোনীর শুরুতেই একফালি সেই একতলা বাড়ির একখানা ঘরে তখনও ঝড় বইছিলো। ললিতার বিবাহ প্রস্তাবের নৌকার এবারেও ঘাটে এসে ভরাডুবি হবার দুঃসংবাদে প্রথমে যেমন আশ্চর্য নীরবতাই ছিলো একমাত্র প্রতিক্রিয়া, এখন ঠিক তার উল্টো কাণ্ড। অর্থাৎ প্রচণ্ড তর্জন গর্জন চলছে এই একফালি একতলা বাড়ির দিনে খাবার এবং রাত এগারোটার পর শোবার ঘরে। যে পাঁচজন গিয়েছিলেন সূর্যকান্তর কাছে সেই পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি বললেন: বারবার বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে যে চিঠির জন্যে, এবারে সেই চিঠির লেখক কে তা জানতেই হবে; প্রয়োজন হলে পুলিসের হেল্প নিতেও পিছপাও হলে চলবে না। বাকী চারজনের মধ্যেও সর্বকনিষ্ঠ যিনি তিনি বললেন: কিন্তু তাতে স্ক্যাণ্ডাল হতে পারে যে! জ্যেষ্ঠ আবার, এবার আর একটু সোচ্চার হন: হোক, ওই জুজুর ভয়েই যে এই উড়ো চিঠি দিচ্ছে সে চুপ

করিয়ে রেখেছে আমাদের এতকাল। আর চুপ করে থাকার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া, ললিতার বিয়ের চেয়েও বড় কথা, তার নামে এই মিথ্যা কলঙ্কের মূল উৎপাটন করা চিরকালের মতো।

মধ্যম পাণ্ডব এতক্ষণ ডাঁটা চুষছিলেন ; কথা বলবার অবকাশ পান নি। এতক্ষণে তাঁর ফুরসৎ হলো : কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না তো দাদা ? দ্বিতীয় পাণ্ডব স্পষ্টোক্তি এবং বক্রোক্তি হয়েতেই অদ্বিতীয় বলে খ্যাত পাড়ায় : ললিতার মতো মেয়ের সম্পর্কে যে এ সন্দেহ পোষণ করে তার জিব খসে পড়বে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব তারই প্রতিধ্বনি করেন : ওকালতি করে যারা তারা নিজের এবং জগতের লোকের সম্পর্কে নোংরা সন্দেহ পোষণ করে আনন্দ পায় কিন্তু তুমি তো ব্রিফলেস গাঁয়ে মানে না আপনি উকিল ; তোমার এ মন্তব্য করবার অধিকার কি ?

সর্বকনিষ্ঠও সায় দেন সর্বজ্যেষ্ঠের কথায় : কেঁচো খোঁড়বার মতো সামান্য ব্যাপারও এটা নয় ; আর সাপ যদি বেরিয়েও পড়ে খুঁড়তে গিয়ে তো দেখা যাবে যে এতদিন আমরা রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছি। ললিতা কোনও এজাতীয় অন্যায় করতে পারে সেজদাও তা বিশ্বাস করেন বলে আমার মনে হয় না। সেজদা জ্যেষ্ঠকে উদ্দেশ্য করে ফোঁস করে ওঠেন : যে যেমন সে তেমনই দেখে অন্যকে, আমি একবারও ললিতার মনে করে একটি কথাও বলি নি। তোমাদের সে যতখানি, আমারও সে ততখানিই স্নেহের এবং বিশ্বাসের পাত্রী। আমি বলতে চেয়েছিলাম, এ চিঠির লেখক যদি আমাদের মধ্যেই একজন হয় তখন ? কথা শেষ করে সেজ ভাই বাকী চারজনের মুখে ওপর সন্দেহের সার্চলাইট ফেলে এমন ভাবে যে কারুর কারুর মুখ জ্বালা করে ওঠে অত্যধিক রশ্মিবিচ্ছুরণের দাহিকা-শক্তিতে। তারা হাত বুলোতে থাকে গালে সবাই, কেবল একজন ছাড়া। তিনি চতুর্থ পাণ্ডব ; তিনি মাথা নাড়েন 'না' করার ভঙ্গীতে : আমি জানি এ চিঠি কে লিখেছে।

একসঙ্গে ধড়াস করে ওঠে চারটি বুক : এতদিন বলো নি কেন ? তোমরা বিশ্বাস করবে না বলে। চতুর্থ পাণ্ডবের নিস্পৃহ উত্তর। বাকী চারজনের উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা আবার : কে সে ? নাম কি তার ? তার নাম—চতুর্থমুখ থেকে উচ্চারিত হবার আগেই সেই কৌতূহলনিবৃত্তিকারী, দরজার কড়া নড়ে ওঠে সদরে সজোরে। কে ? কে কড়া নাড়ছে এমন সময় ?

জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে পাঁচজোড়া চোখ একসঙ্গে আছড়ে পড়ল সদরে। চন্দ্রকান্ত রংপুরহাটের সাড়ে তিন আনি ছোটতরফের ভবিষ্যৎ মালিক ; ললিতার সঙ্গে যার বিয়ের কথা পাকা দেখার দিন ঠিক করতে গিয়ে আজ সকালেই ভেঙে গেছে। ঝড়জলে আজ দুপুরেই সে আবার এখানে কেন ? আশার জোনাকি জ্বলে উঠলো পাঁচজোড়া চোখেই ; পাঁচজোড়া চোখেই প্রশ্নচিহ্ন, আরও হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জনের জন্যই এই জোনাকির আলো নয়তো ? কিন্তু ভাববার সময় পাওয়া গেল না। চন্দ্রকান্ত দেব ততক্ষণে পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়েছে একেবারে সেই ঘরে যে ঘর দিনে খাবার এবং রাত এগারটার পর শোবার ঘর। যেখানে পঞ্চপাণ্ডবের খাওয়া শেষ হয়েছে সবেমাত্র।

চন্দ্রকান্ত কোনও রকম ভণিতা না করেই বলেন : অনিমেষ কে ? ললিতার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ? পঞ্চকণ্ঠ ককিয়ে ওঠে একসঙ্গে : অনিমেষ কে ? তার নাম তো ললিতার কাছে শুনি নি কখনও !

ভিক্টোরিয়া স্কোয়ারের নির্জন অন্ধকারে বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসেছিল তারা দুজনে তখন। ললিতা আর অনিমেষ। ললিতা চৌধুরী আর অনিমেষ হাজরা। অনিমেষ হাজরাই নিস্তব্ধতার বরফ ভাঙলো : জানো লতা, তোমার বিয়ে-ভাঙা এই উড়ো চিঠির লেখক নাকি আমি।

নাকি বলছ কেন অনিমেষ? সত্যিই তো এ চিঠির লেখক তুমি। ললিতার কণ্ঠ কৌতুকোচ্ছল।

আমিই এই চিঠির লেখক? দাও টু ব্রুটাস?—অনিমেষ ঈষৎ ঘাবড়ায় এই লঘুস্বর কথাতেও।

ললিতার গম্ভীর বিষণ্ণ কণ্ঠ এবার করুণ বিপ্রলম্ভ আলাপ করে: যে চিঠিগুলি পাঠাচ্ছে, সে আমার বৈরী নয়; বন্ধুর কাজই করছে সে। আর তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার কে আছে? যদি তুমি এ চিঠি লিখে নাই থাকো, তবুও এর পর আবার প্রয়োজন হলে তুমিই লিখো সেই চিঠি।

যে এই চিঠির লেখক সে তোমার বন্ধু কেন?

কারণ আমার বিবাহ ভেঙে না দিলে এ চিঠি আমার ঘর ভাঙতো—

কি রকম?

আমার মাইনের টাকাতেই বাবার সংসারের চাকা ঘোরে; রংপুরহাটের জমিদার বাড়িতে বউ আর যাই করুক, চাকরি করতে পেত না—

অনিমেষের মুখেও কথা আটকে গেল অনেকক্ষণ।

যে চিঠি নিয়ে রংপুরহাটের সাড়ে তিন আনি ছোট তরফের কলকাতার বাসা বাড়ি থেকে টালিগঞ্জের রামকৃষ্ণ কলোনীর দোরগোড়া পর্যন্ত ঝড় বইতে সুরু করেছে সকাল থেকে সে চিঠির ভাষা স্পষ্ট:

'ললিতা বলে যে মেয়েটির সঙ্গে আপনার পুত্রের বিবাহ পাকা করতে চলেছেন সে মেয়েটি সদ্বংশজাত বটে, কিন্তু সৎ নয়। যদি আমার বক্তব্যে সন্দিহান হন তাহলে বলি—'

'তাহলে বলি' বলে মেয়েটির এমন অঙ্গের এমন একটি গোপন চিহ্নের কথা মিলিয়ে নিতে বলেছে সে, যার পর আর উড়ো চিঠি

বলেও তাকে উড়িয়ে দেওয়া যেমন সম্ভব নয়, সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করাও আবার তেমন অসম্ভব।

অনেক রাত্তির করে সেদিন বাড়ি ফিরলো ললিতা।

বাড়ি ফিরতেই মা টেনে নিয়ে গেলেন ভাঁড়ার ঘরে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন: অনিমেষ কে রে?

ললিতা জবাব দিল: আমার সঙ্গে কাজ করেন। কেন?

মা জবাব দেবার আগেই ললিতা আবার বলে: কাকারা বলেছে বুঝি কিছু?

মা মাথা নাড়ান: চন্দ্রকান্ত এসেছিল আজ; অনিমেষ কে হয় তোর জিজ্ঞেস করছিল।

ললিতার সাড়া না পেয়ে চোখে হাত দেন না ললিতার মা; ললিতার দু চোখের জলে ভিজে গেছে তার বুকের কাপড়। সামলে নিয়ে ললিতা বলে: না মা; অনিমেষ নয়। সে আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। ভালো ঘরে আমার বিয়ে হলে তার চেয়ে সুখী তোমরা ছাড়া আর কেউ হবে এমন কেউ নেই এ জগতে আমার। তা ছাড়া আমি জানি এ চিঠি,—এই পাঁচটা চিঠি কার লেখা।

জানিস? হৃৎপিণ্ড মুখের কাছে লাফিয়ে ওঠে মায়ের, অন্ধকারেও ললিতার তা আন্দাজ করতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না। জানিস, তবু এতদিন বলিস নি?

বলি নি, তার কারণ সে নাম বলা যায় না।

মায়ের কাছেও বলা যায় না?

হ্যাঁ, মায়ের কাছেও বলা যায় না।

ললিতা মিথ্যে বলে নি। সে নাম মায়ের কাছেও বলা যায় না। এ পৃথিবীতে কে বিশ্বাস করবে ক্যাপ্টেন চৌধুরী এ চিঠির লেখক। যাঁর বয়স ছাপ্পান্ন, মাথার চুল কাশফুল সাদা; ললিতা যাঁকে নিজের বাবার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করে, ললিতার অফিসের সেই

চির-বোহেমিয়ান বড়সাহেব ললিতার প্রতি এতদূর অনুরক্ত, কে বিশ্বাস করবে এ কথা? ললিতা নিজেও সেকথা বিশ্বাস করতে না হলে বেঁচে যেত। কিন্তু গত বছর পুজোর ছুটির আগের দিন অফিসের সবাই চলে গেছে যখন, শুধু ক্যাপ্টেন চৌধুরী আর ললিতা ছাড়া যখন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না আর কেউ, তখন—। না, তারপর আর অবিশ্বাস করবার উপায় কোথায়?

॥ দুই ॥

পেছনের ইতিহাসটা এবার একটুখানি না ওল্টালে এ কাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সেই পেছনের ইতিহাস যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব দু-চার কথায় এখন সেরে দেওয়া আশু প্রয়োজন। সে পেছনের কথাটা আর কিছু নয় ললিতার পারিবারিক পূর্বানুবৃত্তি ছাড়া। ললিতার বাবা দেশ ভাগ হবার আগে রাজশাহীর নামকরা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। নামকরা না বলে বদনাম-করা বলাই হয়তো সঙ্গত হবে। কারণ খ্যাতির চেয়ে তাঁর পয়সা ছিল অনেক—অনেক বেশী। এবং ডাক্তারের যখন যে পরিমাণ নাম তার চেয়ে অর্থের পরিমাণ অনেক বেশী হয় তখন বোঝা যায় এ পয়সা লোকের অসুখ ভালো করার কারণে নয়, বরং স্ত্রীলোকের—কুমারী স্ত্রীলোকের সন্তানকলঙ্ক মোচনের অকারণে। ললিতার বাবা চিন্তাহরণ সার্থকনামা। সত্যিই কুমারী কন্যারা বাড়ির যত চিন্তারই কারণ হোক, চিন্তাহরণের দুর্ধর্ষ ফি জোগাতে পারলে তা উবে যেতে একটি কি দুটি ডোজই যথেষ্ট ছিল।

রাজশাহী টাউনে বাড়ি এবং গাড়ি করেছিলেন চিন্তাহরণ কম সময়ের মধ্যেই। এত কম সময়ের মধ্যে, রীতিমতো সাক্‌সেস্‌ফুল ডাক্তারের পক্ষেও চিন্তা করা শক্ত। এবং টাকা—নগদ টাকাও করেছিলেন প্রচুর। কিন্তু উৎপাতের কড়িও যে চীৎপাতে যায়

এ প্রবাদ হয়তো প্রবাদ থেকে যেত যদি না চিন্তাহরণের প্রায় সব টাকা বেরিয়ে যেতে দেখা যেত যেমন এসেছিল তার চেয়েও দ্রুত। ধর্মের কল অন্তত সেই একবার বাতাসে নড়েছিল। নড়েছিলো শম্বুকগতিতে বটে কিন্তু সেই একবার নড়েছিলো সুনিশ্চিত।

বর্ণশ্রী। ললিতার দিদি; ললিতা তখন বাচ্চা। বাতাস নিমিত্ত মাত্র; ধর্মের কল যে নড়িয়েছিলো, সে এসেছিল কলকাতা থেকে। জাপানী বোমা কলকাতার মাথায় পড়বে পড়বে করতেই যখন শহরের কুষ্ঠী বেজুত হয়েছে আর সুদূর মফস্বলের অজ পাড়াগাঁর ভাগ্যের চাকা গিয়েছে উল্টো দিকে ঘুরে, পাথর-চাপা কপাল খুলে গিয়েছে হঠাৎ, সেই ইভ্যাকুয়েশানের হিড়িকে জব চার্ণকের প্রিয় শহর পরিত্যাগ করে উড়ে এসে বরেন্দ্রভূমির আসর জুড়ে বসেছিলো যে, চিন্তাহরণের জন্যে তৈরী সেই মুষলের নাম ঃ প্রিয়ব্রত সরকার। দুর্দান্ত বড়লোকের একমাত্র ছেলে। ডাক্তারী পড়ে নামে মাত্র; আসলে শিকারই জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, মৃগয়াই একমাত্র মহৎ কর্ম। কিন্তু পশু শিকার নয় রমণীয় শিকার। নারীমৃগয়াপটু প্রিয়ব্রতর একমাত্র স্পোর্ট হচ্ছে মেয়েদের সর্বনাশ করা। কুমারী, বিধবা,—কিছুতেই অরুচি নেই এই বিবেকহীন বালকের।

রাজশাহী শহরের প্রমীলাকুলে প্রাইমা ডোনা চিন্তাহরণের কন্যা বর্ণশ্রী। দুরন্ত যৌবন আঠারো বসন্তের শরীরে পিছলে পড়ছে। গায়ের রঙে ঠোঁটে হাসিতে-কান্নায় কটাক্ষে, রাগে-অনুরাগে, কথায়, কথা না বলায়, ঘন ঘন নিশ্বাসের দোলায় বুকের ওঠা-পড়ায়, চলার সময় সরু কটিদেশ চালিত ভারী নিতম্বের তালে তালে উঁচুনীচু হওয়ায় ফেটে পড়তে চাইছে যেন মেঘভাঙা চাঁদ মুহূর্তে। ঝর্ণার মতো উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে রক্তে আগুন লাগে, শ্রোতার অভিমানের তমালছায়া নামে যখন কৃষ্ণপক্ষ রাতের চেয়েও অনেক কালো দুই চোখে আর পায়ে চলা পথের দাগের মতো প্রায়

অদৃশ্য ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল নামে সেই রক্তাভা বিচ্ছুরিত কপোলে তখন মনে হয় সেই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মতো সমরকন্দ লুটিয়ে দিই সেই অমূল্য অশ্রুজলের দু পায়ে। একটু বাদেই আনন্দের রামধনু যখন খেলে যায় আবার চোখের মণিতে তখন মনে হয় ইন্দ্রধনুকে কে বলে সুদূরের, সেই মুহূর্তে তার চেয়ে নিকটতর, তার চেয়ে করতলগত আর কি ?

রাজশাহী কলেজে পড়তে যেত বর্ণশ্রী। সোস্যাল ফাংশানে গান গাইত। বন্যার সময় চাঁদা তুলত। ছেলেদের সঙ্গে বনভোজনে যেত। সাইকেল চাপত সকলের চোখের ওপর দিয়ে। বাড়িতে ঠাকুরকে রান্নায় সাহায্য করত; মাকে পূজার ফুল তোলায়। ছেলেদের সঙ্গে যখন কথা বলত তখন বান্ধবী মনে হতো না; মনে হতো বন্ধু। এই বর্ণশ্রীর সঙ্গে প্রিয়ব্রতর প্রথম সাক্ষাৎ রাজশাহীর শহরে স্মরণীয় দুর্ঘটনা। প্রিয়ব্রত কলকাতা থেকে গিয়েই দু হাতে মুড়িমুড়কির মতো টাকার হরির লুট আরম্ভ করে দিলো। ভাত ছড়ালে কাকের মতো টাকা ছড়ালে মোসাহেবের অভাব হয় কদাচ। প্রিয়ব্রত সরকারের ফোড়ের সংখ্যা হলো সংখ্যাতীত। তারাই বাজি ধরতে বাধ্য করলো প্রিয়ব্রতকে বর্ণশ্রীর সঙ্গে লড়ে যেতে। প্রিয়ব্রতর অনেক দম্ভের মধ্যে দম্ভের হিমালয় ছিলো, রমণীর মনোহরণের খেলায় হার না মানা। হাত বাড়িয়ে দিলো সে তার সাকরেদের দিকে, বললো: ইটস্ এ ডিল।

বলতে বলতেই জুটে গেল সুযোগ; মেঘ না চাইতেই জল। উপলক্ষ্য পায়ে হেঁটে এসে প্রিয়ব্রতর দরজার কড়া ধরে সজোরে নাড়লো। পূজোর আগে রাজশাহী তরুণ সংঘের বার্ষিক সম্মেলন। নাটক অভিনয় হচ্ছে সে সম্মেলনের সর্বপ্রধান আকর্ষণ। নাটক নির্বাচিত হলো, সব সৌখীন দলের আড্ডাতেই যেমন হয় অনেক তর্ক আর অনেকতর চায়ের কাপে তুফান তুলবার পর, ডি. এল.

রায়ের 'সাজাহান। নায়িকার ভূমিকায় বর্ণশ্রী ; আর নায়ক সেই যথারীতি প্রিয়ব্রত। 'নাটকের মধ্যে নাটকে'র অভিনয় আরম্ভ হলো মহলার প্রথম মহড়ার দিন থেকেই। প্রিয়ব্রতর রমণীয় চর্চার প্রথম পাঠ যার কাছে তার একটি নির্দেশ সে মেনে চলত, মেক্ হে হোয়াইল দ্য সান্ শাইনস্। দেরী করলে মেয়ে এবং ট্রেণ দুই-ই ধরা শক্ত এই গুরুবাক্য কদাপি লঙ্ঘন করে নি প্রিয়। তার হাতেখড়ি যার হাতে এই আগুন নিয়ে খেলায় তার মতে জীবনের আর যে কোনও খেলায় 'বেটার লেট দ্যান নেভার' চলে, চলে না রমণীয় খেলায় যার অলিখিত প্রথম ও প্রধান নির্দেশ বেটার নেভার দ্যান লেট'-এর সতর্কবাণী পড়তে না পারলে বিস্মৃত হলেই সর্বনাশ।

প্রথম রাতের মহলা শেষ হতে দেরী হয়ে গেলো। আরম্ভ হয়েছিলো সেদিনের মহলা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে প্রিয়ব্রতর গড়িমসিতে। বর্ণশ্রী তা লক্ষ্য করেও কিছু বলে নি ; মনে মনে হেসেছে শুধু। যেমন হেসেছে মরীচিকা চিরকাল তৃষাতুরকে ছুটে আসতে দেখে অনেক দূর থেকে। প্রিয়ব্রতর মহলা দেরীতে আরম্ভ করার কারণই হচ্ছে তার গুরুর নির্দেশমতো, আসল মহলা অর্থাৎ বর্ণশ্রীর সঙ্গে পাঞ্জা কষার মহড়া যাতে সে রাতেই শুরু করে দিতে দেরী না হয়ে যায়। প্রিয়ব্রত দেরীতে আরম্ভ করলো মহলা যাতে মহলা শেষ হতে এত দেরী হয় যাতে বর্ণশ্রীর পক্ষেও অতরাতে একা বাড়ি যাওয়াটা বাড়াবাড়ি হয়ে দাঁড়ায়। এবং তার ফলে বর্ণশ্রীকে গাড়িতে পৌঁছে দেবার 'মেক হে হোয়াইল দ্য সান শাইন্স্'-এর নীতি অনুযায়ী প্রথম বীজ বোনার কাজ আরম্ভ করতে পারে প্রিয় প্রথম রাতের সেই অতি স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই।

মহলা দেরীতে আরম্ভর দোষ কাটাতে প্রিয়ব্রত স্বয়ং বর্ণশ্রীকে শুনিয়ে ঘোষণা করলো ঃ একটু লেট হয়ে গেল আজ।

বর্ণশ্রী তার মুখ থেকে বাকী কথাটুকুর গ্রাস ছিনিয়ে নিল ঃ

কিন্তু বেটার লেট ছ্যান নেভার আর যেখানেই চলুক, মহলার বেলায় অচল। বেটার নেভার ছ্যান লেট, মনে রাখবেন কালকের মহলা শুরু করার সময়; না হলে আমাকে বাদ দিয়ে নায়িকার ভূমিকায় আর কাকে নেওয়া যায় ভাবতে থাকুন এখন থেকেই।

প্রিয়ব্রত হজম করল বর্ণশ্রীর চোরা আক্রমণ। মনের দাঁতে দাঁত চেপে বললে, আমিও তো তাই চাই; বেটার নেভার ছ্যান লেট!

বহুদিন তোড়জোরের পর আলোর খেলা দেখাবার রাতে খেলা-শুরুর মুহূর্তেই সব আলো দপ্ করে ফুস হয়ে গেলে আলোক সম্পাতকারীর মুখের অবস্থা যেমন হয় অন্ধকার হয়ে যাবার ফলে তা দেখা না যাওয়ায় যেটুকু মুখরক্ষে হয় সেটুকুও যার কপালে জুটলো না সেদিন তারই নাম প্রিয়ব্রত সরকার। মহলার শেষে, বর্ণশ্রীর বাড়ির লোক নিতে এল যখন বর্ণশ্রীকে তখন, তখনই কেবল বোঝা গেল প্রিয়ব্রত পাকা অভিনেতা নয়, যথার্থই অ্যামেচার আর্টিস্ট। তার সমস্ত মুখখানায় যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে কে। বর্ণশ্রী যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে বিবেকের মানা অমান্য করে বর্ণশ্রী: আপনার গৌরবর্ণ মুখখানা হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হলো কেন মিস্টার সরকার?

প্রিয়ব্রত চারপাশে এক ঝটকায় চোখ ঘুরিয়ে আনল; সবাই মুখ টিপে টিপে হাসছে। প্রিয়ব্রত হেসে জবাব দিল বর্ণশ্রীকে: শ্রী চলে গেলে, স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণই পালটে যায়; গৌরবর্ণ তো সে তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর, যতই প্রিয়বর্ণ হোক সে কারুর।

মুহূর্তে রক্তিম বর্ণানন বর্ণশ্রী আর দাঁড়ালো না এক মুহূর্তও।

সবাই উপলব্ধি করল; বর্ণশ্রীও। প্রিয়ব্রত দেশলাইয়ের ভিজে কাঠি নয়, র‍্যানসান লাইটার। পেট্রল ফুরিয়ে এলে একটু ঝাঁকি দিতে হয় মাঝে মাঝে, এই যা।

॥ তিন ॥

ট্যাকটিক্স্ পাল্টালো প্রিয়ব্রত, পুরনো গ্রামোফোনে নতুন রেকর্ড বাজবে না আর। পরের রাতে মহলা আরম্ভ হলো ঘড়ির কাঁটা ধরে। শেষ হলো আকাশবাণীর তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হবার আগে। সাক্সেসফুল রিট্রিট করল সাজাহান নাটকে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ প্রিয়ব্রত। বাঘ থাবা গুটিয়ে বসল, নাগালের মধ্যে শিকার দেখেও তাগ করল না পর্যন্ত। প্রিয়ব্রতের সাময়িক অন্তরঙ্গ মহল পর্যন্ত গোড়ায় পূর্ণ অবিশ্বাস করেও সম্পূর্ণ হতবাক হলো অতঃপর। বর্ণশ্রী পর্যন্ত শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করল 'নোটোরিয়াস অতীত'—প্রিয়ব্রত সরকারকে। সে প্রিয়ব্রতই নয় যেন। অভিনয় ছাড়া আর কিছুতেই ইন্‌টারেস্ট আছে মনে হয় না; মাছের চোখ ছাড়া যেমন অর্জুনের চোখ থেকে জগৎও লুপ্ত, তেমনই প্রিয়ব্রতরও কেবল ঔরংজেবের রোলটুকুর জন্যেই যেন বাঁচা। রাজশাহীর সৌখীন রঙ্গ জগতের নবসম্রাজ্ঞীর অটল আসন টলমল করতে লাগল কলকাতা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা অভিনয়ানভিজ্ঞ এক অর্বাচীনের ভারে।

প্রিয়ব্রতর বাড়িতে গিয়েও দেখা পায় নি প্রিয়পারিষদরা। চাকর বলেছে, বাবু বাড়ি আছেন বটে, তবে মনে করে নিতে হবে বাড়ি নেই। সারাদিন দরজা বন্ধ করে, খাওয়া-নাওয়া বন্ধ করে অভিনয়ের সময়টুকু ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরুনো বন্ধ করে প্রিয়ব্রত। ঔরংজেবকে ইতিহাসের কবর থেকে তুলে এনে, মূর্তিকে প্রাণ দেয় যেমন করে সিদ্ধ সাধক, তেমনই করে 'জীবন' দিচ্ছিলো রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জায়। অভিনয়ের আগের রাতে ড্রেস রিহার্স্যলের দিন বোঝা গেল স্পষ্টই যে ঔরংজেবের কাছে জাহানারার হার কেবল ডি. এল. রায়ের নাটকেই নয়, রাজশাহীর তরুণ সংঘের বার্ষিক উৎসবে, মঞ্চের ওপরেও একবার সৌখীন রঙ্গজগতের নাট্য-

সম্রাজ্ঞীর দারুণ হার হবে কলকাতা থেকে বোমার হিড়িকে আগত প্রিয়ব্রত সরকারের কাছে। সবচেয়ে স্পষ্ট হল যার কাছে এ বার্তা সবচেয়ে আশ্চর্য হল সে-ই পরের রাত্রে, প্রকাশ্য অভিনয়ের দিন। আশ্চর্য হয়ে গেল মঞ্চের পাদপ্রদীপের সারি পর্যন্ত সবাই।

ঔরংজেবের সঙ্গে জাহানারার সাক্ষাতের দৃশ্যে প্রিয়ব্রত সরকারকে দেখা গেল ফল্টার করতে; পার্ট ভুলে যেতে; নার্ভাস হয়ে কুঁকড়ে যেতে। মঞ্চের ভাষায় যাকে বলে সেই ঔরংজেবের সিন অর্থাৎ ঔরংজেবের হাততালি বাঁধা সে দৃশ্যেও প্রিয়ব্রত অদৃশ্য হলো। সহস্র করতালিতে অভিনন্দিত হলো বর্ণশ্রী চৌধুরীই শেষ পর্যন্ত।

রাজশাহীর সৌখীন মঞ্চের নাট্যসম্রাজ্ঞীর আসন বজায় থাকল সম্রাট কন্যার ভূমিকায় বর্ণশ্রীর অভিনয়ে নয়, প্রিয়ব্রত সরকারের অভিনয়ে।

পরের দিন পদ্মার তীরে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা করল বর্ণশ্রী কোনও খবর না দিয়ে; এবং কোনও ভণিতা না করে চোখ রেখে চোখে প্রশ্ন করল: কালকে কি হলো ওটা?

ভাজা মাছ উল্টে খেতে না জানার নিরীহ মুখ করে প্রিয়ব্রত উত্তর দিল: কালকের কোন ব্যাপারটা?

বর্ণশ্রী এবার বলা বাহুল্য জেনেও বলতে বাধ্য হলো: কালকের অভিনয়ের কথা বলছি—।

প্রিয়ব্রত এবার বর্ণশ্রীর চোখের গভীরে চোখ রেখে উচ্চারণ করল আস্তে আস্তে: কালকের ব্যাপারটা অভিনয় কে বললে আপনাকে?

বিস্মিত বর্ণশ্রীর মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো: 'তবে?'

'অভিনয় নয়'—বহুদূর থেকে যেন উত্তর এলো কার।

লাল রঙের শাড়ি পরে এসেছিল বর্ণশ্রী চৌধুরী। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল পদ্মার ওপারে। তার আলো এসে পড়েছে পদ্মার জলে;

খুইয়ে প্রিয়ব্রতর বাড়িতেই যাবে কি যাবে না তাই নিয়ে যখন নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে মুহূর্মুহুঃ আলোড়িত হচ্ছে তখনই প্রিয়ব্রতর চিঠি এলো বর্ণশ্রীর নামে। চিঠিটা ছোটো। বর্ণশ্রীর কাছে প্রিয়ব্রতর প্রথম চিঠি। ক্রিম রঙের দামী কাগজে সবুজ রঙের অক্ষর ঈষৎ এলোমেলো।

সুপরিচিতাসু,

রাজশাহী ছেড়ে চলে যাচ্ছি চিরকালের মতো। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। যদি অবশ্য তোমার দিক থেকে দেখা করার কোনও বাধা না থাকে তবেই। দেখা না হলে দুঃখ পাব। কিন্তু কোনও অভিযোগ করব না। কারণ আমার সঙ্গে দেখা করবার তোমার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

যদি দেখা কর তো আজ সেদিন যেখানে এসেছিলে সেখানে এসো, সন্ধ্যা ছটায়। ইতি—

প্রিয়।

চিঠিটা কতবার পড়লো বর্ণশ্রী বলা শক্ত। দেখা হলে কি কি বলবে প্রিয়ব্রতকে মনে মনে মহলা দিলো তার কতবার বলা সহজ নয়। তবুও পদ্মার তীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো হয়ে আসা জলে দিনের ভাটার শেষে যখন রাত্রির জোয়ার প্রায় এলো বলে তখন দূর থেকে প্রিয়ব্রতকে দেখে বর্ণশ্রীর বুকের সব রক্ত উঠে এলো মুখে। রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করতে লাগল নদীর জলের মতো। হৃদয়ের যবনিকা হলো কম্পমান।

প্রিয়ব্রত বর্ণশ্রীকে দেখে উঠে এলো ঘাটে বাঁধা নৌকো থেকে: ভেবেছিলাম যাবার আগে দেখা পাব না। আমার ভাগ্য বরাবরই ভালো। এখন বুঝছি আমার ভাগ্য লোকে যত ভালো বলে তার চেয়েও অনেক ভালো। আপনি কি বলেন?

চিঠির 'তুমি' মুখের 'আপনি'তে পরিবর্তন কান এড়ালো না

বর্ণশ্রীর। সে বলল, আমি কিছু বলি না। কেবল জানতে ইচ্ছা করি, এটি আপনার কোন্ নাটকের সংলাপ ?

প্রিয়ব্রত হাসলো। ঈষৎ করুণ হাসিতে ম্লানমুখে বলল, আমার ভাগ্য অনেক ব্যাপারেই দারুণ ভালো। একটা ব্যাপারে কিন্তু অসীম দুর্ভাগ্য আমার বরাবরই। লোকে আমার বানানো কথাগুলোকে সত্যি আর সত্যি কথাগুলোকে মনে করে বানানো।

বর্ণশ্রী নিজেকে সামলে নিয়েছে শেষ মুহূর্তের কোন্ অজানা শক্তির মহিমায় বর্ণশ্রী নিজেও তা জানে না। প্রিয়ব্রতকে দেখা দেবার মুহূর্তে সে ভেবেছিলো কথাই বেরুবে না মুখ দিয়ে। প্রিয়ব্রতর প্রথম কথার মুহূর্ত থেকেই মুখ খুলে গেল তার। সহজ হয়ে উঠল অত্যন্ত সহজেই। এবারে সে প্রিয়ব্রতর কথার জবাবে বলল, আমারও তো ওই সমস্যা।

কি ?

কোন্‌টা সত্যি, আর কোন্‌টা বানানো ?

মানে ?

মানে, চিঠির 'তুমি', না, মুখের 'আপনি' ?

চিঠিতে তুমি লিখেছি বলে রাগ করেছেন ?

না। এখন রাগ করছি।

সত্যি ?

হাতটা বর্ণশ্রীর ধরলো প্রিয়ব্রত। তারপর নিয়ে গেলো মাঝিহীন নৌকোয় পদ্মার সন্ধ্যার নির্জনে। বর্ণশ্রী নৌকোয় উঠে বলল, সবাই আপনার মতো বানানো কথা বলে এ ধারণা আপনার হলো কোথা থেকে ? নিজের মতোই অবশ্য দুনিয়াকে মনে করে সবাই—

বিবর্ণ হয়ে উঠল প্রিয়ব্রতর উজ্জ্বল মুখ। বর্ণশ্রীর 'আপনি' সম্বোধনে আহত প্রিয়ব্রত বলল, আপনি করে বলছো কেন আমাকে ? তুমিও কি আজ আমাকে তুমি বলবে না ?



বর্ণশ্রী অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বড় লজ্জা করে।

প্রিয়ব্রত মুহূর্তকাল সময়ও নিলো না জবাব দিতে: কিন্তু আমার লজ্জা নেই স্বীকার করতে আজ তোমার কাছে যে আমি তোমার সঙ্গে মেশবার যোগ্য নই।

বর্ণশ্রী তাকালো তার বড় বড় কালো দুটো চোখ তুলে প্রিয়ব্রতর দিকে। প্রিয়ব্রত তার জীবনের কনফেশান করে গেল। দীর্ঘ কনফেশান। কত মেয়ের মন আর শরীর নিয়ে সে খেলা করেছে তার নির্লজ্জ স্বীকৃতিতে বাধা দিলো না বর্ণশ্রী। প্রিয়ব্রত যা বলতে চায় তা বলুক। বেরিয়ে যাক তার প্রমত্ত দিনের পঙ্কিল আবর্জনা। বর্ণশ্রী তার মন ঠিক করে ফেলেছে। বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না সে। কনফেশানের শেষে প্রিয়ব্রত বলল, আজ একজনের কাছে, জীবনে প্রথম যে একজনের কাছে হার মেনেছি আমি, যে একজনের কাছে এসে প্রথম অনুভব করেছি যে মেয়েদের শরীর ছাড়াও আছে আরও কিছু যার দাম দেওয়া যায় না। আজ তার কাছে আমার সমস্ত কথা স্বীকার করে শুরু হবে আমার প্রায়শ্চিত্তের পালা।

প্রায়শ্চিত্ত হবে আমার কিসে আমি জানি না,—প্রিয়ব্রত থামল না, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদৌ সম্ভব কিনা তাও আমার অজানা। আমি শুধু জানি যে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হতে হবে আমাকে। দিন থেকে দিনে, দণ্ড থেকে দণ্ডে। তোমাকে পেয়েও তাই আমি পাব না 'ব'। কারণ তোমাকে পাবার জন্যে শুচি হতে হয়। তাই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে আমি জানি। এবারে যদি আমি নাও পাই তোমাকে, কোনও এক জন্মে আমি তোমাকে পাবই, এই আশা নিয়ে আমি মরবার সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকব। শুনেছি মানুষ মৃত্যুর সময় যা কামনা করে মরে, মরবার পর সেই ইচ্ছা তার সঙ্গে যায়। আবার জন্মমুহূর্তে সেই ইচ্ছাপূরণের ভাগ্যও ভূমিষ্ঠ হয় নবজাতকের সঙ্গে।

একথায় যদি সত্য থাকে, তোমাকে চাওয়ায় যদি না থাকে ফাঁকি তাহলে 'ব' কোনওদিন আমি তোমাকে পাবই; কেউ ঠেকাতে পারবে না তোমাকে আমার হাত থেকে সেদিন, এক যদি না—

থামল প্রিয়ব্রত। দম নিল। তারপর বলল, যদি না তোমার আপত্তি থাকে অবশ্য।

বর্ণশ্রী এখনও বলল না কিছু। শুধু নৌকোর দাঁড়টা তুলে দিল প্রিয়ব্রতর হাতে। অন্ধকার পদ্মায় নৌকো বেরুলো নিরুদ্দেশ যাত্রায়। তীরে নির্জন তমসায় দাঁড়িয়ে ছিল একজন। তৃতীয় কারুর দিকে তাকাবার সময় পেলে বর্ণশ্রী এবং প্রিয়ব্রত দুজনেই জানত যে সেই অপেক্ষমান তাদের দুজনেরই জানা। তার নাম রঞ্জনা।

প্রিয়ব্রত বর্ণশ্রীকে যা যা বলেছিল তার প্রত্যেকটি কথা কানে যাচ্ছিল নিস্তব্ধ ফাঁকা পদ্মার তীরে ওত পেতে দাঁড়িয়ে থাকা রঞ্জনার। মনে পড়ে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত ঠিক এই কথাগুলো বলেই সর্বনাশ করেছিল রঞ্জনার। এবং হুবহু সেই এক কথাগুলো বলেই সর্বনাশ করবে বর্ণশ্রীর। কিন্তু বর্ণশ্রীকে এখন তা বলতে গেলে বর্ণশ্রী তাকে ছোটলোক ভাববে। আর বলতে যাবেই বা কেন রঞ্জনা। সে তো এই-ই চেয়েছে।

পদ্মার অন্ধকার জল থেকে উঠে এলো যখন বর্ণশ্রী আর প্রিয়ব্রত, তখন বর্ণশ্রীর জীবনের মধুরতম মুহূর্তের নিষিদ্ধ আস্বাদের পর আচ্ছন্ন অবস্থা। প্রিয়ব্রতর মনের কথা জানতে পারলে বর্ণশ্রী যে ভুল করল সে ভুল কোনও মেয়েই করত না। কিন্তু চোর পালালে তবেই যে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে সেই মানুষের বিশেষ পরিচয়, সে মেয়েমানুষ।

মেয়েদের বিপদ ঘটে যায় কখন মেয়েরাও তা জানে না। যখন জ্ঞাত হয় বিপদের বার্তা তার অনেক আগেই উড়ে যায় পরিমল

লোভে যে অলি একদিন উড়ে এসেছিল সে। বর্ণশ্রী চৌধুরীর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

॥ পাঁচ ॥

প্রিয়ব্রত সরকারকে যারা তন্নতন্ন করে জানে, তারাও বিশ্বাস করবে না। কতখানি কনফিডেন্ট হলে ট্রেনে কামরা রিজার্ভ করে, মাল পাঠিয়ে দিয়ে, অন্তরঙ্গদের অপেক্ষা করতে বলে তবে জীবন্ত মৃগয়ায় বেরুনো যায়, ফেরা যায় ভিনি-ভিডি-ভিসি বলতে বলতে তা প্রিয়ব্রতর অতীত ইতিহাসের কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ পর্যন্ত যাদের মুখস্থ তাদের পক্ষেই গলাধঃকরণ করা সহজ নয়। উপন্যাসের যে কোনও রমণীরমনের চেয়ে প্রিয়ব্রত কত বেশি জ্যান্ত লেডিকিলার তার বর্ণনা প্রত্যয়যোগ্য করা ইজ মাচ বিয়ণ্ড ব্যালজাক'স পেন; বর্তমান লেখা যার কলমে উচ্চারিত তার পক্ষে এ দাবী করা যে অবিশ্বাস্য অবিমৃষ্যকারিতা হবে তা বলা বাহুল্য। তাই সে কথা থাক। এখন তার বদলে প্রিয়ব্রতের কথা হোক। প্রিয়ব্রত সরকারের বর্ণশ্রী বিজয়ের নেপথ্য সমাচার। বর্ণশ্রীকে হারিয়ে দেবার চেয়ে তাকে জয় করার কৌশলের ইতিবৃত্ত কম রোমাঞ্চকর নয়। সম্ভবত বেশি কৌতূহলকর।

বর্ণশ্রীকে নিয়ে বাজি ধরেছিলো প্রিয়ব্রত। এমন বাজি সে আগেও ধরেছে বন্ধুদের সঙ্গে। এমন বহুবারই সে বাজি মেরে দিয়েছে হেসে। কিন্তু এমন বাজি ধরেনি আগে সে। এমন বাজি জেতেনি প্রিয়ব্রত কখনও। বন্ধুদের কাছে মুখে স্বীকার না করলেও বাজির মোমেণ্ট থেকে বাজি জেতার মুহূর্ত পর্যন্ত কোনও সময়েই সিওর ছিলো না সে। যদিও ট্রেনে কামরা রিজার্ভ করে, মাল পাঠিয়ে দিয়ে গাড়িতে, বন্ধুবান্ধদের দাঁড় করিয়ে রেখে যে সময়ে পদ্মার তীর থেকে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করবে বলেছিলো

তার থেকে খুব বেশি ব্যবধান ঘটতে দেয়নি সময়ের কোনও পর্বেই।

বর্ণশ্রীর জন্যে সন্ধ্যে ছটার পাঁচ মিনিট আগে পদ্মায় পোঁছেছে। নৌকো ভাড়া করেছে; মাঝিকে সরিয়ে দিয়েছে। বর্ণশ্রীর সঙ্গে সংলাপের জন্যে সময় ধরেছে আধঘণ্টা, পদ্মার তীর থেকে স্টেশন পোঁছতে দশ মিনিট। নৌকোয় বর্ণশ্রীকে নিয়ে পদ্মার অতল অন্ধকারে ভেসে গিয়ে আবার অকূল আলোতে উত্তীর্ণ হবার জন্যে সময় ধরেছিলো দু ঘণ্টা। দশ মিনিট আগে পোঁছে গেছে তীরে। স্টেশনে গিয়ে উঠেছে যখন, নটা বাজতে পুরো সতের মিনিট বাকি তখনও। থ্রি চিয়ার্স দিয়েছে সবাই। প্রশ্ন করেনি একজনও ব্যাপারটার অবধারিত সাফল্য সম্পর্কে। করেনি কারণ ফেস ইজ দ্য ইনডেক্স অফ মাইণ্ড। প্রিয়ব্রতর জ্বলজ্বলে চোখ, ফর্সা মুখে ফেটে পড়া রক্তের লাল যুদ্ধজয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার উদগ্র কৌতূহল কেবল অর্জুনের তীর কোন পথে এবার মাছের চোখ বিদ্ধ করলো তাই নিয়েই।

সে ইতিহাস এত সংক্ষিপ্ত যে প্রিয়ব্রতর পক্ষেও তা এক গেলাসের ইয়ারদের গলা জড়িয়ে গেলানো অসম্ভব, তাই সে চুপ করে গেলো। বলল, পরে হবে সব কথা। অ রিভোয়া।

ট্রেন ছেড়ে দেবার প্রথমে সিগারেটটা ধরিয়ে অন্ধকার বাইরে চোখ মেলে দিতেই প্রিয়ব্রতর হৃৎপিণ্ড মুখে লাফিয়ে উঠলো। বর্ণশ্রী দাঁড়িয়ে। চোখ রগড়ে নিয়ে তাকালো। না, বর্ণশ্রী নেই কোথাও। বর্ণশ্রী আসবে কোথা থেকে? আবার সিগারেটে টান দিয়ে অন্ধকারে ছেড়ে দিলো নিজের দৃষ্টিকে। বর্ণশ্রী এগিয়ে আসছে তার দিকে। অন্ধকার থেকে আলোয় মুখ ঘুরিয়ে বসতেই চীৎকার করে উঠতে চাইল তার গলা। আওয়াজ বেরুলো না। বর্ণশ্রী বসে আছে ওপাশের বেঞ্চিতে। হাসছে। বর্ণশ্রী যেন

বলতে চাইছে, প্রিয়ব্রত, তুমি এবারে জেতনি ; হেরে গেছ ; ভীষণ হেরে গেছ।

সমস্ত রাত ধরে ট্রেনের চাকার সেই টেপরেকর্ড বেজে গেল—প্রিয়ব্রত তুমি হেরে গেছ, ভীষণ হেরে গেছ।

প্রিয়ব্রত এই প্রথম তার রমণীমনোহরণ খেলায় হাতেখড়ি দিয়েছিলেন যিনি সেই গুরুর কথায় কিছুতেই আস্থা রাখতে পারছে না। গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবার জন্যে উদগ্র উন্মুখ হয়ে উঠছে সে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে। গুরুনির্দেশ ছিল স্পষ্ট ;—এক মেয়ের কাছে বারবার যেও না। যতক্ষণ না সে হ্যাঁ বলছে ততক্ষণই তার সঙ্গে খেলা। তারপর খেলা খতম এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভুলে যাওয়া, হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে চিনতে না পারা এবং যথাসময়ে আবার নতুনতমার সঙ্গে সেই পুরাতন খেলার পুনরাবৃত্তিই হচ্ছে এই চিরজীবন্ত খেলায় কখনো না হারার একমাত্র পথ। সেই পথেই পা বাড়িয়েছিলো প্রিয়ব্রত সেই একই রকম পদ্ধতির সুনিশ্চিত সিদ্ধপ্রত্যয়ে। কিন্তু বর্ণশ্রীকে সে ভুলতে পারছে না খেলায় অতি সহজেই জিত হবার পরেও। বরং এখন যেন বর্ণশ্রী পেয়ে বসেছে আরও।

প্রিয়ব্রতকে অতি সহজেই ধরা দিয়েই অতি সহজে হারিয়ে দিয়েছে বর্ণশ্রী।

কলকাতায় তখন বোমার হিড়িকে ছিটকে পড়ার দলেরা ফেরেনি ফাঁকা কলকাতায় যেদিকে তাকায় প্রিয়ব্রত সেদিকেই ভেসে ওঠে পদ্মার তীর, জেগে ওঠে বর্ণশ্রীর মুখ। মনে হয় প্রিয়ব্রতর, তার পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নেই। দুষ্মন্তের চেয়েও অনুতাপের অনল তাকে যন্ত্রণা দেয় অনেক বেশি। দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে ভোলার পেছনে হাত ছিল দুর্বাসার শাপের। অঙ্গুরীয় মাছের পেটে যাওয়া ছিল উপলক্ষ। প্রিয়ব্রত কার ওপর চাপাবে বর্ণশ্রীকে বঞ্চনার অমোচনীয় অপরাধের বোঝা?

এখনও সময় আছে। এখনও করা যায় বঞ্চনার প্রতিকার বর্ণশ্রীর কাছে ফিরে গিয়ে।

প্রিয়ব্রতর পৃথিবীতে যে ঝড় এলো বলে তার খবর প্রিয়ব্রতর চোখে পড়তে যাঁর দেরী হয় না, তিনি প্রিয়ব্রতর মা। একদিন প্রিয়ব্রতর মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করেন তিনি, কি হয়েছে রে খোকা? এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল প্রিয়। অকপটে বলে গেল তার মেয়েদের বঞ্চনার আনুপূর্বিক ইতিহাস। বর্ণশ্রীকে ভুলতে না পারার বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া নামা চোখের পাতায় প্রিয়ব্রতর মা তার আগেই আঁচ করেছেন সে বৃত্তান্ত। তিনি প্রদীপের আলোর মতো নরম স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, তুই ফিরে যা খোকা, কালই ফিরে যা তোর জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধুর কাছে। ফিরে গিয়ে বোধ হয় তাকে পাবি না। তুই যাদের ঠকিয়েছিস তাদের কেউ এতক্ষণে নিশ্চয় তোর বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস রং চড়িয়ে বলে বিভ্রান্ত করেছে বর্ণশ্রীকে এতদূর যে আর তোকে বিশ্বাস করা শক্ত হবে তার পক্ষেও। যদি সে তোকে আবার বিশ্বাস করে তাহলে জানবি এই অনুতাপেই তোর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। যদি তাকে না পাস সেখানে, তাহলে বাকী জীবন বর্ণশ্রীর জন্যে তোকে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দুঃসহ অপেক্ষায়। কোনও একদিন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি খোকা, কোনও এক জন্মে তুই পাবি বর্ণশ্রীকে, এ আশীর্বাদ আমার ব্যর্থ হবে না, যদি তোর আজকের স্বীকৃতি সত্য হয়—

কারুর কাছ থেকে শুনতে চাইছিল প্রিয়ব্রত। কেউ তাকে বলুক বর্ণশ্রীর কাছে ফিরে যেতে। এ পৃথিবীতে যার কাছে একথা শুনলে সকাল হবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না রাত্রির অন্ধকার অবসানের, সেই মায়ের মুখে যাবার নির্দেশ পেয়ে, মাকে জড়িয়ে ধরলো প্রিয়ব্রত : মা, তুমি কি অন্তর্যামী?

মা হাসলেন। অমানিশির অসীম অন্ধকারে দিক্‌ভ্রান্ত মানুষের

হতাশায় যে হাসি জ্বালেন সূর্যের প্রদীপে মাতা বসুন্ধরা প্রতিদিন প্রভাতের প্রথম পুণ্য পবিত্র পাবক-মুহূর্তে।

রাজশাহীতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রিয়ব্রতর বুক ছাঁৎ করে উঠলো একটি নাম মনে আসতেই—রঞ্জনা দে।

প্রিয়ব্রত সেই রাতেই কলকাতা ফিরে গেছে শুনে বর্ণশ্রীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন হঠাৎ। স্বপ্নভঙ্গের মুহূর্তে মনের আকাশ ছেয়ে সাংঘাতিক কালো মেঘের পাখায় ঝড় এলো। সেই ঝড় যা জীবনে প্রথম পদ্মার অন্ধকারে উত্তাল করে তুলেছিল প্রথম বসন্তের রোদনভরা রাতকে। সেই ঝড়ের ভয়ঙ্কর কালো নখ যে অন্ধকারে ওত পেতেছিলো যৌবনের স্বপ্নে আচ্ছন্ন আকাশকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে বলে তা কাল একবারও যেমন মনে হয়নি, পরের দিন সকালে তেমনই তাছাড়া আর কিছু মনে করার কারণ রইলো না। আজকের দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট প্রিয়ব্রতর সেই আসল চেহারা একটি মাত্র ঘটনায়। সে ঘটনা প্রিয়ব্রতর প্রস্থানে সূচিত হয়েছিল মাত্র। সম্পূর্ণ হয়নি। সম্পূর্ণ করবার ভার নিল বর্ণশ্রীর আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু রঞ্জনা দে। বর্ণশ্রীর যৌবননাট্যে চরম অভিনয়ের জন্যে প্রিয়ব্রতর প্রবেশের আগে যেমন প্রস্থানের পরমুহূর্তেও তেমনই ভেসে উঠলো যেন পদ্মার অতল থেকেই বর্ণশ্রীর স্বপ্নের সোনার তরীর তলা ফুটো করে দিয়ে চোরা ডুবোজাহাজের মতোই।

পদ্মার তীরে বাঁধা নৌকোয় বর্ণশ্রীর কানে যেকথা বলেছিল প্রিয়ব্রত তা হুবহু আউড়ে গেল রঞ্জনা। বলল, বর্ণশ্রীকেই প্রিয়ব্রত যে একথা বলেছে তা নয়, এই প্রথম যে, তাও নয়। রঞ্জনার কথাই যদি তার বক্তব্যের একমাত্র প্রমাণ হতো তাহলেও বর্ণশ্রীর স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরী হতো না হয়তো; কিন্তু রঞ্জনা তার ব্লাউজের যক্ষপুরী থেকে বার করে আনলো প্রিয়ব্রতর প্রথম চিঠি। তার একমাত্র

চিঠি। যে চিঠি সে সবাইকেই লিখেছে এযাবৎ। বর্ণশ্রীকেও। বর্ণশ্রী রঞ্জনার চিঠির প্রতিটি অক্ষর মেলালো মনে মনে। তাকে লেখা প্রিয়ব্রতর চিঠির এর চেয়ে ট্রু যার কাপি সে কোন সিদ্ধতম স্টেনো হস্তেও অসম্ভব ছিল।

বর্ণশ্রী রাজশাহী ছেড়ে চলে গেল সেই দিনই কাশীতে মামার বাড়িতে।

প্রিয়ব্রত রাজশাহী থেকে অনুসরণ করতে পারত বর্ণশ্রীকে। অনায়াসেই পারত। কিন্তু রঞ্জনাই তাকে জানিয়ে দিয়ে গেল অযাচিত সে বর্ণশ্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও আর ফল হবে না। সে নিজের চিঠি তো দেখিয়েছেই ; অন্যদের চিঠিও বর্ণশ্রীকে দেখাতে প্রস্তুত। সেই এক চিঠি। প্রিয়ব্রত কাকে বোঝাবে যে এই প্রথম সে ভালোবেসেছে একজনকে। সে একজনেয় জন্যে তার অপেক্ষা কোনও দিন না ফুরোবার।

শকুন্তলাকে না পেয়ে দুষ্মন্ত ফিরে গেল কলকাতায়। দুর্বাসার অভিশাপই জয়ী হলো, মায়ের আশীর্বাদ নয়।

ছ'মাস বাদে পদ্মার জলে ভেসে উঠল বর্ণশ্রীর বীভৎস মরা দেহ। পরনে লাল শাড়ি—যা পরে একদিন প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল বর্ণশ্রী নিজে থেকে। সন্ধ্যার মতো রাঙা বাস পরা সেই কুমারীর গর্ভে তখন রাত্রির অন্ধকারে দিনের মতো অপেক্ষা করছে বর্ণশ্রীর সন্তান। সেই সন্তানের লজ্জা ঢাকবার জন্যেই পদ্মার জলে বর্ণশ্রী তার অস্তিত্বের ওপর ঢেকে দিয়েছে মৃত্যুর রূপহীন আবরণ।

প্রিয়ব্রত তখন, বর্ণশ্রীর জন্যে তার অপেক্ষা যে কত জেনুইন তারই প্রমাণ দিতে কিনা কে জানে গিয়ে বসেছে বিয়ের পিঁড়িতে। পাত্রীর নাম, রঞ্জনা দে।

॥ ছয় ॥

এক সময়ে সে বার্তা গিয়ে পেঁাছলো বর্ণশ্রীর বাবার কাছেও। কিন্তু তখন তাঁর পক্ষে দেরী হয়ে গেছে অনেক। আসন্ন বিপদের চেয়েও আরও অনেক বড় বিপদ যে আসন্ন চিন্তাহরণের বিনিদ্র রাত্রির চিন্তার পর্দায় প্রতিফলিত সেই আশঙ্কার ছায়া ক্রমেই বড় হতে থাকলো বিবেকের প্রোজেকশান মেসিনে। যে পাপ তিনি এতদিন ধরে নির্দ্বিধায় করে চলেছিলেন সেই পাপের পঙ্কে এতদিন বাদে আজ ফুটেছে প্রায়শ্চিত্তের পঙ্কজ, অনুতাপের অশ্রুজলে তার পূর্ণ প্রস্ফুটনের আগেই সকলকে বিপন্মুক্ত করতে বর্ণশ্রী একদিন খুব সকালে যা করল তাতে বিপদ বাড়ল বই কমল না। কন্যার আত্মহত্যার খবর গোপন করতে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুমতি পেতে পুলিসকে একদিনে যা দিতে হলো, চিন্তাহরণের মতো দুর্মূর্ষ 'ফি'-এর ডাক্তারের পক্ষেও তা অনেক বছরের উপার্জন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কেবল বর্ণশ্রীর নয়; চিন্তাহরণের বিপুল পসার যে কারণে, অনুতাপের অনলে দগ্ধ চিন্তাহরণ নিজের হাতে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে ত্যাগ করলেন সাত পুরুষের ভিটে। বাড়ি গাড়ি বেচে সপরিবারে চলে এলেন কলকাতায়। কিন্তু সেখানেও দুর্ভাগ্যের রাহুমুক্তি হলো না তাঁর। তাঁর হাতে তখনও বেশ কয়েক হাজার টাকা। পাপের বেতন মৃত্যু; একেবারে মৃত্যুর চেয়েও অনেক মারাত্মক তিলে তিলে মরা। তারই নিমিত্ত স্বরূপ যে দেখা দিল চিন্তাহরণের ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইডের বেশে তার নাম অবিনাশ। সার্থকনামা লোকই বলতে হয় তাকে এক দিক দিয়ে। কারণ চিন্তাহরণের মতো অনেক লোকের বিনাশ হবার পরেও অবিনাশের কিছুই হয় নি। সে সত্যিই অবিনাশীই আছে তখনও।

চিন্তাহরণের বাকী টাকার চিন্তা যথারীতি লাঘব করেছে

কয়েক বছরের মধ্যে অবিনাশ। এবং যথা সময়ে অদৃশ্য হলো। চিন্তাহরণের পঙ্গু জীবন আরম্ভ হয়েছে তার আগে থেকেই। ইতোমধ্যে কেবল দুটি ভালো কাজ করেছিলেন তিনি গত জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে কে বলবে! এক, ললিতাকে বি. এ. পাস করিয়েছিলেন তিনি; দুই, একতলা একখানি ভাঙা বাড়ি কিনেছিলেন টালিগঞ্জের এই প্রত্যন্ত পরিত্যক্ত প্রদেশে। এবং মুখ বুজে ভগবানের মার খাচ্ছিলেন চিন্তাহরণ। তবে তাও কতদিন খেতে পারতেন বলা শক্ত হত যদি না ললিতা যুদ্ধের দৌলতে একটা মোটামুটি সচ্ছল মাইনের চাকরি পেয়ে যেত সরকারী অস্থায়ী অফিসে।

চিন্তাহরণ বেঁচে রইলেন তারই ফলে। না হলে তাঁকেও বর্ণশ্রীর মতোই ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটার চেয়েও দুর্গম পন্থা, আত্মহত্যার পথেই খুঁজতে হত মুক্তির পথ!

॥ সাত ॥

ক্যাপ্টেন চৌধুরী ভারি আশ্চর্য মানুষ। চুলে তাঁর পাক ধরেছে বটে কিন্তু তিনি সবার সমবয়সী। অস্থায়ী সরকারী হিসেব অফিসের এক নম্বর বর্তমানে এই স্থায়ী সরকারী কর্মচারী। হাসিতে খুশিতে, রসিকতায়, রাগে অনুরাগে ভরপুর ক্যাপ্টেন চৌধুরীর আড়ালে সবাই তাঁকে ডাকে 'পাগলা সাহেব' বলে। বলার কারণও আছে যথেষ্ট। এই যাকে না দেখলে ভাত হজম হচ্ছে না পাগলা সাহেবের কাল তার মুখ দেখতেও মানা। সে সাহেবের অফিসে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে পাগলা সাহেব চেয়ারের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে সেই যে বসেছে সে আর যতক্ষণ সেই গতকালের প্রিয়দর্শন এবং আজকে দেখলেই বিরক্তি যাকে সে না বার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আর ঘুরোতেন না ক্যাপ্টেন চৌধুরী। যত ইমপর্ট্যান্ট

ফাইলই হোক না কেন, পড়ে থাকবে সাহেবের টেবলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা স্বাক্ষরের জন্যে। সে স্বাক্ষর সম্ভব হবে সেদিনকার জন্যে অবাঞ্ছিত মানুষটি উঠে গেলে তবেই। আজকে অফিসের সবচেয়ে কম মাইনের যে কর্মচারীর জন্যে পদত্যাগ করতে প্রস্তুত ক্যাপ্টেন, কাল তাকে ঘর থেকে নয় শুধু, অফিস বাড়ি থেকে না বার করা পর্যন্ত অস্থির পাগলা সাহেব।

মদ আর বেহালা আর সেক্সপীয়ারের নাটক—ক্যাপ্টেন চৌধুরীর এই তিন সঙ্গী। চতুর্থ—রমণীয় সঙ্গীও খুব ক্যাস্যুয়াল। প্রথম তিনটির প্রতি আসক্তির তুলনায় চতুর্থর প্রতি আকর্ষণ প্রায় নিরাসক্তির পর্যায় গিয়ে পড়ে।

ললিতা যে সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন চৌধুরীর চোখে নিজের সর্বনাশ দেখেছিল সে সন্ধ্যায় গোলাপী নেশায় ভুরভুর করছিলেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী। ললিতাকে নিঃসন্তান বিপত্নীক পাগলা সাহেব স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। পাগলামি করতেন যখন তখনও ললিতা কিছু বললে জানতেন, ললিতার কথা শুনতে হয়। অধস্তন কর্মচারীরা বিশেষ বিব্রত হলেও মুশকিল আসান করত যে মুহূর্তে সে ললিতা ছাড়া আর কে। গত বছর পূজার ছুটির আগের দিনও ললিতা সেই আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ক্যাপ্টেন চৌধুরীর টেবলের সামনে। সে এসেছিল পূজার পর ছুটির প্রয়োজন জানাতে। অগ্রহায়ণ মাসে তার বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে। ছুটির আবেদন প্রায় জানাবার আগেই গ্রাণ্ট করলেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী। তারপর খুব ক্যাস্যুয়ালি জিজ্ঞেস করলেন, পূজোর তো ছুটি পাচ্ছ, আবার পূজোর পর ছুটি কেন ? কোথাও বাইরে যাচ্ছ ?

ললিতা মাথা নাড়লো : না।

তবে ?—আবার প্রশ্ন পাগলা সাহেবের।

আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে অঘ্রাণে ; তার আগে মাস-খানেক ছুটি—

কথা শেষ করতে হলো না ললিতাকে। একটা আধক্ষ্যাপা সদানন্দ আনন কি আশ্চর্য রকমে পলক না ফেলতেই পরিবর্তিত হতে পারে সাইলক্ মুখে, ললিতার মতো নিজের চোখে তা দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত।

দাঁতে দাঁত ঘষার শিরাছিন্নকর শব্দ করতে লাগলেন পাগলা সাহেব। চোখে নেমে এলো নিষ্ঠুর আক্রোশের অগ্নিবর্ণ দৃষ্টি। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। চেটোয় চেটো ঘষতে লাগলেন পাগলের মতো। ভুরভুরে গোলাপী গন্ধর বদলে নাকে এল হায়নার হিংস্র বাস। তারপর বললেন, বিয়ের জন্যে ছুটি দেওয়া সম্ভব নয় মিস্ চৌধুরী।

মিস চৌধুরী!—বজ্রাহত ব্যক্তির মতো স্থাণু ললিতা অনেক-ক্ষণ—অনেক—অনেকক্ষণ ধরে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মুখে তার নাম 'মিস্ চৌধুরী' বলে উচ্চারিত হতে শুনে। ললিতার বাবা যদি ললিতাকে এ নামে ডাকত কখনও তাহলে ললিতা যা সন্দেহ করত বাবার মাথার সম্পর্কে, ক্যাপ্টেন চৌধুরীর সম্বন্ধেও তার একই সন্দেহ হলো। পাগলা সাহেব পাগলাই হয়ে যায় নি তো সত্যি সত্যি?

না, মিস চৌধুরী,—আবার নতুন নামে কর্কশকণ্ঠে বলে ওঠেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী: না, বিয়ের জন্যে আপনার অফিস কামাই করবার প্রয়োজন হবে না।

কেন?

কারণ এ বিয়েও হবে না বলে আমার মনে হয়, এর আগেও যেভাবে বিয়ে ভেঙে গেছে, এবারেও সেভাবেই ভেঙে যাবে।

ললিতা তাকিয়েছিল এক পল সময়। এক পলকেই সে পড়েছিল সেদিন ক্যাপ্টেন চৌধুরীর চোখে তার আসল কথা। যেকথা মেয়েরা পড়তে পারে পুরুষের চোখে কিন্তু কাউকে পড়াতে পারে না।

ক্যাপ্টেন চৌধুরীর ঘর থেকে বেরিয়ে খালি হয়ে যাওয়া অফিসের অসীম শূন্যতায় দু চোখ ভরে কেঁদেছিল সেদিন ললিতা চৌধুরী। চোখের জলে ঝাপসা হয় নি; স্পষ্ট হয়েছিল এ বার্তা যে, যে চিঠির জন্যে বার বার তার বিয়ে ভেঙে গেছে—এবারেও যাবে, সেই উড়ো চিঠির লেখক কে?

॥ আট ॥

আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারবেন না,—যুক্তকরে কপাল স্পর্শ করতে করতে বলল আগন্তুক।

অনিমেষ হাজরা হেসে ফেলল তার মুখের ওপরই: আপনার নাম তো চন্দ্রকান্ত দেব?

আপনার অনুমান নির্ভুল,—আগন্তুক উত্তর দেয় এবং পুনরায় প্রশ্ন করে: কিন্তু এর আগে কখনও আমাকে—

এর আগে আপনাকে কখনও দেখিনি আমি, তাহলে চিনলাম কি করে এই তো?

অনিমেষ হাজরার হাসি আবার ঠোঁটের ঈষৎ মুক্ত দরজা দিয়ে দাঁত বার করে। চন্দ্রকান্ত দেব মাথা হেলান: হ্যাঁ।

অনিমেষ হাজরা সঙ্গে সঙ্গে নিরসন করে সন্দেহ: সেকথা যদি বলেন তাহলে বলি আমি তো জর্জ দ্য সিক্সথকেও দেখিনি; তবু তাঁকে দেখলেই চিনব, যেমন আজ আপনাকেও প্রথম দেখতেই চিনেছি।

জর্জ দ্য সিক্সথের বেলায় যা সত্য সকলের বেলায় তা প্রযোজ্য কি?

নয় কেন?

কারণ তাঁর ছবি দেখে দেখেই তাঁকে দেখবার আগেই চেনা হয়ে গেছে।

যদি বলি, আপনার বেলাতে তাই হয়েছে; আপনারও ছবি দেখেছি এতবার—

আমার ছবি? কোথায়?

মলির ড্রেসিং টেবিলে, শোবার ঘরে, তার গর্ব-পেটিকার বিরাট গহ্বরেও।

মলি বোস? বালিগঞ্জ প্লেসের?

আপনার অনুমান সত্য; মলি আমার পিসতুতো বোন।

কিন্তু,—অস্ফুট আওয়াজ করে চন্দ্রকান্ত: কিন্তু, সেখানে আমাকে দেখেননি বা আমার কথা শোনেননি কখনও, এই তো?

হ্যাঁ।

সেবেলাতেও ওই জর্জ দ্য সিক্সথের ক্ষেত্রে যেকথা খাটে আপনার ক্ষেত্রেও সেই একই থিয়োরি খাটবে।

মানে?

সোজা।

কি রকম?

জর্জ দ্য সিক্সথের ছবির মতোই তাঁর কথা আমি অনেক জানি। কিন্তু তিনি আমার নাম জানেন না; ছবি দেখার তো কথাই ওঠে না।

কটাক্ষ করছেন?

সত্য কথা বলাকে কটাক্ষ করা বলেন যদি তাহলে তো এ বেচারা গরীবের বলা হয় না।

না না, আপনি কি বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন, আমি শুনব।

বলতে চাইছি যে, আপনি রংপুরহাটের সাড়ে তিন আনি ছোট তরফের সূর্যকান্ত দেবের ছেলে আর আমি অস্থায়ী সরকারী অফিসের পৌনে তিনশো টাকার কেরানী; কার নাম, কার ছবি, কার শোনা এবং দেখার সম্ভাবনা বেশী, আপনিই বলুন।

যাক যাক, ঝগড়া করতে আসিনি আপনার সঙ্গে সাত-সকালে ; এসেছিলাম—

ললিতার বিয়ে ভেঙে গেছে আপনার সঙ্গে যে চিঠির জন্যে সে চিঠি কার লেখা জানতে।

এক্স্যাক্‌টলি সো !

প্রথমে শুনেছিলেন এই হতভাগ্যের নাম তার লেখক বলে ; এখন অবশ্য সে ভুল ভেঙে গেছে।

কি করে বুঝলেন ?

ভুল না ভাঙলে আমার কাছে আসতেন কি ? টিক্‌টিকি লাগাতেন আমার পেছনে এতক্ষণে।

আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম প্রথমে। সন্দেহ ভেঙে গেল যখন—

যখন ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন কোনও লেখক নেই ; এ চিঠি যে লিখেছে সে একজন লেখিকা।

এবার আর চন্দ্রকান্তর মুখেও কথা যোগালো না, ক্যাপ্টেন চৌধুরী কি বলেছেন তার মোটামুটি রিপোর্টিং করল যখন অনিমেষ হাজরা।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী সত্যি সত্যি যেদিক থেকে তাঁর আসবার কল্পনাই করেননি একচক্ষু হরিণের দল সেই দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করেছিলেন সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে। সূর্যকান্তর কাছে উপবিষ্টাবস্থায় আমরা সর্বপ্রথম এবং ললিতাদের দিনের বেলায় খাবার এবং রাত এগারোটার পর শোবার ঘরে দেখেছি দ্বিতীয়বার সেই পঞ্চপাণ্ডব সমেত চন্দ্রকান্ত গিয়েছিল ক্যাপ্টেন চৌধুরীর কাছেই। অনিমেষ হাজরার নাম করাতেই তিনি বলেছিলেন, না। এবং আরো বলেছিলেন তখনই যে এ চিঠির লেখক সম্পর্কে একটা মস্ত ভুল হচ্ছে এই যে সবাই ধরেই নিয়েছে যে এ চিঠির লেখক কোনও পুরুষ সে যে-ই হোক ; কারণ চিঠিগুলি একটি মেয়ের

সম্পর্কে। এবং সেই লেখক ললিতার প্রতি প্রণয়াসক্ত এতদূর যে সে নিজে বিয়ে করতে না পারার ক্ষোভ ললিতার বিয়ে ভেঙে দিয়ে মেটাতে চাইছে বারবার। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে সম্পূর্ণ অন্য কথা। কখনও কখনও পুরুষের চেয়ে মেয়েরা হয় মেয়েদের অনেক বড় বৈরী। এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে ললিতার বিবাহে ঈর্ষায় মরে যাবে তার কোনও বান্ধবী। কিংবা ললিতার সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব যার সেই ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট আর কোনও মেয়ে তাকে না পাবার দুঃখে হয়তো ললিতার বিয়ে দেবার বিকৃত আনন্দের মধ্যে বিস্মৃত হতে চাইছে।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞেস করল, এমন কোনও মেয়ের কথা আপনি জানেন?

ক্যাপ্টেন চৌধুরী তাঁর কাশফুল-সাদা চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, না। কিন্তু জানি কি করে এই চিঠির লেখিকাকে আবিষ্কার করা যায় তার দুর্ভেদ্য গোপনতা থেকে, বার করে আনা যায় দিনের আলোয়।

পঞ্চপাণ্ডবের অর্কেস্ট্রায় বেজে ওঠে : কি করে?

ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন, যে রাস্তায় আপনারা চলেছেন সে রাস্তায় নয়, তাতে দুনিয়াসুদ্ধ লোককে সন্দেহ করা ছাড়া আর কিছুই করা হচ্ছে না।

এবারে সোলো গায় চন্দ্রকান্ত : তাহলে কি করা যায়?

ক্যাপ্টেন চৌধুরীর পাইপের চিতা ছাই হয়ে যাচ্ছিল; অগ্নিসংযোগ করলেন আবার। তারপর বললেন, কাজ একটা করা যায় অবশ্য।

কি?

আবার একটা ফেক্ ম্যারেজ অ্যারেঞ্জ করা যায় ললিতার।

ফেক্?

হ্যাঁ। রটিয়ে দিতে হবে যে ললিতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে;

এমনভাবে রটাতে হবে যেন কাকপক্ষী পর্যন্ত অবিশ্বাস না করতে পারে।

বেশ, তারপর ?

তারপর চোখ কান খোলা রাখলেই ধরা পড়বে কে লিখেছে চিঠি। কারণ এবারেও সে চিঠি লিখবে যে উড়োচিঠি দিয়েছে এতকাল।

॥ নয় ॥

বাড়ির ভেতর ঢুকেই পা আটকে গেল ললিতার। দাদার ঘর থেকে তুমুল ঝগড়ার আওয়াজ আসছে। বৌদির আর দাদার কলহ নতুন নয় এ বাড়িতে; বোধ হয় কোনও বাড়িতেই স্বামী-স্ত্রীর মন-কষাকষি বা কথা-কাটাকাটি কোন ঘটনাই নয়। এবাড়িতে ললিতার দাদা পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে তার বউ গায়ত্রীর দিবারাত্র খিটিমিটির একাধিক কারণ আছে; সবচেয়ে বড় কারণ পূর্ণচন্দ্র বেকার। পূর্ণ বেকার বললে সত্যের অপলাপ হয় বটে কিন্তু পুরোপুরি বেকার হলে পূর্ণর তো বটেই বাড়ির সকলেরও মঙ্গল হত। পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী সিনেমায় কাটা সৈনিকের পার্ট করে আজ এতদিন ধরে যে যে-কোনও লোক যেমন ছবি বিশ্বাসের নাম জানে। তেমনই এক ডাকে যাকে চেনে সে ওই পূর্ণ চৌধুরী; ডাকনামে চেনে তাকে। পূর্ণ চৌধুরীর নামের সঙ্গে যুক্ত বন্ধনীর মধ্যে তাই লিখতেই হয় পোঁটা; পোঁটা চৌধুরী। কোনও কোনও পরিচালকের ছবি হলে তাতে যে পোঁটা চৌধুরী থাকবেই এক সিনের, আধ সিনের একটা কথা, আধটা কথার পার্টে এ তাদের সকলেরই জানা কথা যাদের বলে চিত্র-পাখা; অর্থাৎ ফিল্‌ম্‌ ফ্যানস্‌।

পোঁটা চৌধুরী পুরো বেকার হলে কেন সকলের ভালো হত, না, তাহলে তার গুণ না থাক, দোষও জুটত না একটা। সেই

মারাত্মক পানদোষ, ফিল্ম্ লাইনে যা প্রায় অবধারিত বলে লোকের ধারণা। পোঁটা চৌধুরী হয়ত ফিল্মে না এলেও সেই দোষ যে তার হত না তা নয়, কিন্তু তার বাড়ির এবং আত্মীয়-স্বজন শুভানুধ্যায়ীর ধারণা যে ছবিতে প্লে করতে নেমেই সে নেশার রাস্তা বেয়ে নেমে গেছে এতদূর যেখান থেকে তাকে আবার সুস্থতায় ফিরিয়ে আনা শক্ত নয় শুধু—অসম্ভব। অবশ্য পোঁটা যদি বড় অ্যাক্টার হত তাহলে পান-দোষ তার গুণ হয়ে হায় দাঁড়াত কিনা একথা হলফ করে বলা যায় না। হয়ত তখন মাল খেয়ে গড়াগড়ি গেলেও পাবলিকে, লোকে ধন্যি ধন্যি করত; মনে করত, যে মাল খায়নি এমন করে, সে কি করে করবে নিমচাঁদ, কি জীবানন্দ? কিংবা বাঙালীর ব্যর্থ জীবনের অব্যর্থ নায়ক দেবদাস? কিন্তু সে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় মুলতুবী রেখে মোদ্দা কথায় আসা যাক ফিরে।

পোঁটা চৌধুরীর হাল চিরদিন এমন ছিল না। য়ুনিভার্সিটি য়িনস্টুটে এককালে যারা উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রকে দেখেছে রাম থেকে আরম্ভ করে সিরাজ-এর রোলে পর্যন্ত তারা ভাবতেই পারবে না সেই পূর্ণচন্দ্র আজ কি পরিমাণ রাহুগ্রস্ত। একথা ঠিক যে অন্তরঙ্গ মহলে পূর্ণ সেদিনও পোঁটাই ছিল। কিন্তু তারাও জানত পোঁটা চৌধুরীই আগামী দিনের পেশাদার রঙ্গমঞ্চেরও অবশ্যম্ভাবী নটসম্রাট না হোক তার কাছাকাছি কেউ হবেই। মর্ণিং শোস দ্য ডে,—এই পাঠ্যপুস্তকের সত্য যে জীবনের গ্রন্থে কি পরিমাণ অসত্য পোঁটা চৌধুরীই তার একমাত্র নয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তির চোখে চোখে কোটির একজন মাত্র—এই যা সান্ত্বনা।

পোঁটা চৌধুরীর মর্ণিং রীতিমত ব্রাইট বিগিনিং-এর পর্যায়ে পড়ত একদা। প্রথমতঃ অভিনয়-প্রতিভা রাজশাহীর এই চৌধুরী পরিবারের বংশগত ব্যাপার। বর্ণশ্রী রাজশাহী সৌখীন নাট্যমঞ্চের সম্রাজ্ঞী ছিল। ললিতার বাবার মধ্যে তেমন অভিনয়-ক্ষমতার

পরিচয় প্রদীপ্ত না হলেও ঠাকুর্দা কৃষ্ণবল্লভ চৌধুরী একা অভিনয়, নাট্য পরিচালনা, মঞ্চপ্রতিষ্ঠা তো করেইছেন, তার ওপর তাঁর ছিল নাট্য-রচনায়ও অনস্বীকার্য দক্ষতা। তিনি নাটক-পাগলা লোক ছিলেন এক কথায়। তাঁর ছোট তালুকদারি যে শেষ পর্যন্ত নামে তালুক,—ঘাট ডোবে না'-র দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল তার অনেকটাই, অনেকটা কেন, প্রায় সবটাই এই পাগলামির কারণেই। সেই পাগলামি এক পুরুষ টপকে দেখা দিয়েছিল, বর্ণশ্রীর মধ্যে নয়। প্রথমে তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু পাগলমির মতো যাকে পেয়ে বসেছিল ছেলেবেলা থেকে সে হচ্ছে পূর্ণচন্দ্র ওরফে পোঁটা।

পাড়ার যাত্রার আসর থেকে ফিরে এসে একদিন বাড়ির সকলকে যখন তার বিস্ময় ব্যক্ত করছে তখন দিদিদের মধ্যেই কে যেন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা পোঁটা, তুই পারিস প্লে করতে?

খু-উ-উব—

পোঁটার আত্মবিশ্বাস অসীম যে তার স্ট্রেস 'উ'-তে।

একটু করে দেখা দেখি।

পোঁটা উঠে দাঁড়াল তড়াক করে; হাত পা নেড়ে হঠাৎ বীভৎস চীৎকার পোঁটার: পুঁটি মাছ—

তারপরেই কি হল কে জানে, আর একটা অক্ষরও গলা দিয়ে বেরুলো না পোঁটার।

কি হল রে?

প্রশ্নের উত্তরে মুখচোখ লাল পোঁটা পালাতে গেল; পালাতে গিয়ে দড়ির অভাবে গুণ্ডুলি পাকানো ইজের খসে পড়ল পোঁটার; আর পোঁটা পালাল তিনতলার চিলে কোঠায়। পোঁটার বয়স তখন বড়জোর সাত কি আট।

পালালো বটে পোঁটা দিদিদের ছাদ-ফাটানো হাসির ক্রাউড থেকে, কিন্তু অভিনয়-প্রতিজ্ঞা থেকে হড়কে এল না বালক একলব্য।

রাজশাহীর শিশির ভাদুড়ী নটবর দে-র নটমূর্তি ধ্যান করতে করতে একদিন সে দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল নটবর-প্রিয় বড়লোক-তনয় সুব্রত আচার্যর। মহাভারতের পৌরাণিক আদর্শ-র মতো পোঁটাকে অবশ্য গলায় শিরা ছিঁড়ে উপহার দিতে হলো না; কারণ সুব্রত আচার্য স্বয়ং সবচেয়ে বড় ভক্ত হয়ে দাঁড়ালো পোঁটার। এবং নটবর আচার্য মারা গেল কিছুদিনের মধ্যেই। তার কিছুদিন পর পোঁটারা চলে এল কলকাতায়।

পোঁটার বাবার হাতে তখনও বেশ কিন্তু টাকা; পোঁটার ভবিষ্যৎ পেশাদার রঙ্গমঞ্চে উজ্জ্বল যে একথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছাত্রাবস্থাতেই নিঃসন্দেহ প্রতীয়মান হলো বোদ্ধা বন্ধুর কাছে। বাড়ির লোকেরাও শেষ পর্যন্ত বাধা হল না যেদিন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পঞ্চাশ টাকা মাইনের পাদপ্রদীপের আলোয় অর্জুনের ভূমিকায় নরনারায়ণ নাটকে সেনসেসানাল আত্মপ্রকাশ করল। কাগজওয়ালারা এক বাক্যে বন্ধুগোষ্ঠীর বিশ্বাসকে সমর্থন জানাল। পোঁটা সেই সময় অলরেডি ঢুকু-ঢুকুতে অভ্যস্ত হয়েছে। মেয়েমানুষের বাড়ি যেতে হয় না তাকে। থিয়েটারের মেয়েরা বরং বাড়ি ফিরতে দিতে চায় না প্রায় রাত পোয়ানোর আগে পর্যন্ত। বাড়িতে বাঁধার জন্যে পোঁটাকে পোঁটার মা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে দিলেন ডাগর-ডোগর চাঁদপানা মুখকে বউ করে আনার জন্যে। পোঁটা তাতে একবারও আপত্তি করল না। একদিন গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় বাড়ি ফিরে এল হাসি-হাসি মুখে। বউকে বাড়িতে ফেলে দিয়েই বেরুলো পারুলের সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দোতলার ফ্ল্যাটে। তার আগের সন্ধ্যাটা তার মাটি হয়েছে বিবাহ উপলক্ষ্যে। প্রথম রাতের বাচ্চা বউ বুঝল না বটে, তবে পোঁটার বাবা বেশ বুঝলেন যে বিয়ে দিয়ে পোঁটার শুধু শুধু আরেকটা মেয়ের সর্বনাশ ডেকে আনলেন তিনি। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে এত—ধনুক থেকে তীর ছুটে গেছে এতদূর যে তাকে ফিরিয়ে আনার পথ নেই আর।

নতুন বউ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বরাত খুলে গেল কিন্তু পোঁটার নতুন করে। থিয়েটারে থিয়েটারে পাঞ্জা কষার সুযোগে, পঞ্চাশ টাকা থেকে আড়াইশো টাকায় উঠে গেল তার দর। পোঁটার প্রথম বাচ্চা, ফুটফুটে মেয়ে হল একটা; সৌভাগ্যের উৎস বলে পোঁটা তার নাম রাখলো—মেয়েটার ডাক-নাম রাখলো পোঁটা—পয়া।

ঠিক এই সময়ই মঞ্চের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা থেকে পোঁটা পা বাড়ালো ফিল্মের চোরাবালিতে।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি। কালো টাকায় আলো গোটা টলিউড। সে যে আলো নয়, আলেয়া—অনেকের মতই পোঁটা চৌধুরীরও আরও খ্যাতি, আর আর অর্থান্ধ চোখে তা ধরা পড়ল না কিছুতেই কারণ তা ধরা পড়বার নয়। খারাপ সময় আসে যখন মানুষের তখন প্রথমেই যা বিপর্যস্ত হয় তা বুদ্ধি। সেই বিপর্যস্তবুদ্ধি পোঁটা চৌধুরীকে ভালো করে ডোবাবার জন্যে নিয়তি এল ফিল্‌ম্‌-রোলের ছদ্মবেশে একের পর এক। টাকা বেশি আর নাম বেশির লালসায় স্টেজ ছেড়ে ছিলো যেদিন পোঁটা সেদিনই তার ভরাডুবি আরম্ভ হলো; তবে তা বোঝা গেল আরও কয়েকদিন পর যখন পোঁটা চৌধুরী অভিনীত প্রথম ছবি বেরুলো বাজারে। প্রমাণিত হলো আরেকবার সেই অব্যর্থ সত্য যে সাইকেল চড়তে জানলেই ঘোড়ায় চড়া যায় না। মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতা ফিল্মে অভিনয়ের সঙ্গে পর্যাপ্ত নয়।

পোঁটা চৌধুরী পর পর সব ছবিতে মার খেল এবং স্টেজে ফিরে যাবার পথও নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে এসেছিল সে, কারণ মঞ্চে আবার কম মাইনের কাজ করা তার কাছে ফিল্মে ছোট রোল করার চেয়েও দুঃসহ অপমানজনক বলে বাজলো। আস্তে আস্তে মঞ্চের অবিসংবাদী ভবিষ্যৎ এক নম্বর, পোঁটা চৌধুরী কেমন করে কয়েক বছরের মধ্যে ফিল্মে কাটা সৈনিকের পার্ট-করা অ্যাক্টারে

পরিণত হলো তার ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যা প্রাসঙ্গিক তা হচ্ছে পোঁটার এর মধ্যে আরও গোটা কয়েক সন্তান জন্মালো; বউ মার খেতে খেতে এখন রক্তের জোর কমে আসা পোঁটার ওপর আপারহ্যাণ্ড নিতে আরম্ভ করে দিলো। নেওয়ার কারণ, তার শেষ সোনাটুকু গেছে পোঁটার নেশার অতলে তলিয়ে।

ললিতা চাকরি নেবার পর এবং বাড়ি চালাবার ভার তুলে নেবার পর থেকে পোঁটার অপদার্থতা নিয়ে, পোঁটার বউ গায়ত্রী আরও উচ্চকণ্ঠে, আরও কর্কশ বাক্যে খোঁটা দিতে থাকে যখন-তখন। এবং ললিতা তার জন্যে মর্মান্তিক দুঃখ পায়। দাদার সম্পর্কে তার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে; তবুও দাদার জন্যে তার মনের কোণায় কোথায় যেন আজও খচখচ করে একটা উৎপাটন-অসম্ভব কাঁটা, পোঁটা আজও ললিতাকেই কেবল বাড়ির মধ্যে তার দুঃখের অংশীদার মনে করে। আসলে তাও নয়। আসলে, ললিতা পচে-হেজে-মজে ফুরিয়ে যাওয়া একটা প্রতিভাকে এখনও পূজো করে।

সেই দাদার ঘরে বৌদির কাককণ্ঠে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনেই ললিতা থেমে গেল।

গায়ত্রী বলছিল, তোমার বোনের কথা আর বলো না; ভালোই হবে যদি তো তার নামে চিঠি যায় কি করে?

উড়ো চিঠি?

একখানা দুখানা নয়; পাঁচখানা—

আরও কি বলতে যাচ্ছিলো গায়ত্রী। বলা হয় না তার। অনেক—অনেকদিন পর ক্ষেপে যায় পোঁটা। লাফিয়ে পড়ে গায়ত্রীর ওপর বাঘের মতো। চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনে; তারপর চালায় কিল চড় লাথি সমানে। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, অনেক সহ্য করেছি, আর না। পোঁটা চৌধুরী এখনও মরেনি। আর যার নামে যা ইচ্ছে বলতে পারো, ললিতার নামে একটি কথা বলবে কি তোমার জিব উপড়ে নেব।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ললিতার দুচোখ ছাপিয়ে জল নামে। ঘাড়ের ওপর উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শে চমকে ফিরে তাকিয়ে যাকে দেখে তাকে দেখে ভূত-দেখার চেয়েও চমক লাগে। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বলতে পারে ললিতা: আপনি!

শুষ্ক কঠিন হাসিতে ঈষৎ মুক্ত হয় ওষ্ঠের দ্বারপ্রান্ত আগন্তুকের: কেন, আমার কি এবাড়িতে আসা বারণ?

॥ দশ ॥

ললিতার বাবার সঙ্গে ললিতার মায়েরও তুমুল বাক্-বিতণ্ডা হচ্ছিলো সেই মূহূর্তে। ললিতার মা জগদ্ধাত্রী দেবী ভারি ঠাণ্ডা মানুষ। এবাড়িতে তিনি ন বছর বয়সে এসেছিলেন; এখন তাঁর বয়স ষাটের কোল ঘেঁষে এল। চিন্তাহরণ ডাক্তার যেদিন অসৎ পথের সুড়ঙ্গে কালো টাকার পাহাড় বানাচ্ছিলেন সেদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করেননি। যদিও টাকার প্রতি তাঁর নিস্পৃহা যেকোনও মহাপুরুষের চেয়ে এতটুকু কম নয়; অসৎ পথে আহৃত সম্পদের প্রতি তাঁর ঘৃণা কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতই সহজাত। তবুও কোনও কিছু নিয়ে সাংঘাতিক ফুসফাস করাও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি কেবল তাঁর স্বামী চিন্তাহরণকে বলেছিলেন যে উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যাবে যে এ বিষয়ে ভুল নেই; মাঝের থেকে সংসারেও অভিশাপ লাগবে। জগদ্ধাত্রী দেবী জানতেন যে, যেহেতু ওই টাকা দিয়েই তাঁকে সংসার চালাতে হবে সেইহেতু তিনিও পরোক্ষভাবে এই পাপের অংশীদার হচ্ছেন। তবু তার জন্যে তাঁর এতটুকু অভিযোগ নেই। স্বামীর সঙ্গে নরকে গেলে তাকেই স্বর্গ বলে মেনে নিতে আপত্তি যার, জগদ্ধাত্রী দেবীর মতে সে মেয়ে হিন্দু নয়। কিন্তু যাদের নিরপরাধ জীবনে এর ফলে বিষাক্ত হাওয়া লাগছে সেই ছেলে-মেয়েদের অকল্যাণ তাঁকে প্রায় সারাক্ষণ

আটকে রাখত ঠাকুরঘরে। নিয়ত প্রার্থনায় নিরত জগদ্ধাত্রী দেবীর প্রার্থনা ছিলো গোপালের কাছে—ধন নয় মান নয়; নয় পরিত্রাণের প্রার্থনা। তাঁর নিবেদন ছিলো বংশীধারীর পায়ে—স্বামীর অসৎ রোজগারের রাস্তা বন্ধ কর। তাতে যদি পথে বসতে হয় সবাইকে নিয়ে তাও ভালো। কারণ সে পথের দুঃখ এই বিপথের সুখের থেকে ধর্মগ্রাহ্য; বিবেকমান্য।

জগদ্ধাত্রী দেবীর সেই প্রার্থনা তাঁর ঠাকুর রেখেছিলেন অচিরেই।

সেই কোন অবস্থাতেই বিচলিত নন যিনি, দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ, বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ এক রমণী আজ এত উত্তেজিত যে ললিতার কানে তা আশ্চর্য ঠেকল। এতদূর আশ্চর্য যে সে থেমে গেল ঠিক যেমন থেমে গিয়েছিল একটু আগে পৌঁটার ঘরের সামনে।

জগদ্ধাত্রী দেবী বলছিলেন ললিতার বাবাকে: একটা মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে বলে বলছি না, একটা নিরপরাধ মেয়ে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে শুধু শুধু আর আমরা যারা তারা মা-বাপ তার রোজগারে মুখে অন্ন তুলছি, আমরা কেউ উঠে-পড়ে লাগছি না জানবার জন্যে যে এ শত্রুতা কে করছে লতার সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে।

ললিতার বাবা চিন্তাহরণ ডাক্তার গড়গড়া টানছিলেন, মুখ থেকে নল খুলে নিয়ে তিনি স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, কি করতে পারি আমি বল?

অবিনাশকে সন্দেহ করতে বলি।

উঠে বসলেন উত্তেজনায় ডাক্তার: অবিনাশের কথা তো মনে হয়নি কখনও!

জগদ্ধাত্রী দেবী নিরুত্তেজ কণ্ঠে বলেন, আমার মনে হয়েছে অনেকবার।

কেন ?

অবিনাশ তোমার শনি, যেদিন এবাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় সেদিন সে কি বলেছিলো মনে আছে ?

না।

আমার আছে; তার প্রতিটি শব্দ আমার কানে এখনও বাজছে।

কি বলেছিলো সে ?

শাসিয়েছিলো এই বলে যে, সে যাচ্ছে বটে, তবে আবার সে আসবে।

অবিনাশ কি বাঘ না ভাল্লুক যে আমাদের খেয়ে ফেলবে ? আসুক না অবিনাশ।

বললেন বটে ললিতার বাবা চিন্তাহরণ ডাক্তার; জোরের সঙ্গেই বললেন। কিন্তু যত জোরে বললেন বোঝা গেল ঠিক সেই পারিমাণে কমজোরী করে গেছে তাঁর আথিক হাল যে তাঁর আবার আগমনে, আবার অশুভের ছায়াপদপতনে শিউরে উঠলেন তিনি। রাজশাহীর প্রভাব, অর্থ, ঘরবাড়ি, সব ছেড়ে যে রাহুর ধাক্কায় তিনি কলকাতার এলেন বর্ণশ্রীর কলঙ্কিত মৃত্যুর কারণে সেই রাহু তাঁকে ত্যাগ করেনি যে তার প্রথম এবং অদ্বিতীয় প্রমাণ হয়ে দেখা দেয় সে এই অবিনাশ। অবিনাশকে অবশ্য তিনি মূর্তিমান রাহু বলে চিনতে পারেননি, সোদন অবিনাশকে তাঁর পরম সুহৃদ মনে হয়েছিল সেদিন; নির্বান্ধব পাষাণপুরী কলকাতার মরুভূমিতে মনে হয়েছিলো মরূদ্যান।

তখনও ডাক্তারের হাতে বেশ কিছু নগদ টাকা। মনুষ্যেতর প্রাণী যেমন মাংসের গন্ধ পায়, কোনও কোনও মানুষ তেমনই পায় টাকার গন্ধ। অবিনাশ সেই গন্ধেই এসে হাজির হলো একদিন সন্ধ্যায় চিন্তাহরণের বাড়ির দরজায়।

তাকে প্রথম দেখেছিলেন যিনি তিনি জগদ্ধাত্রী; এক নজর

দেখেই তিনি বলেছিলেন কলির সবে সন্ধ্যা; পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ নয়, সুরু হয়েছে মাত্র।

অবিনাশ আসলে কি তা বোঝার সময় তখনও হয়নি অবশ্য; তখনও পর্যন্ত তার পরিচয় ছিলো বাড়ি, জমির শোয়ারের দালাল বলে। সেই ছদ্মবেশেই অবিনাশের প্রবেশ এবাড়িতে; এবং কয়েক বৎসর আগে প্রস্থান যখন তখন টালিগঞ্জের প্রত্যন্ত প্রদেশে এই বাড়িখানাই সম্বল মাত্র চিন্তাহরণ ডাক্তারের। সেই বাড়ি থেকে বিচ্যুত করবার জন্যেই অবিনাশ শাসিয়েছিলো নাকি আবার আসবে বলে।

জগদ্ধাত্রী দেবী স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়েই ললিতাকে দেখে প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে রে লতা?

অবিনাশ কাকা এসেছে আবার।

ললিতা শুকনো মুখে জবাব দেয়।

কথাটা ঘরের মধ্যে ডাক্তারের কানে যায়; মুখখানা রক্তশূন্য মড়ার মতো সাদা হয়ে যায় তাঁর মুহূর্তে।

একসময়ে অবিনাশকে অবশ্য ডাক্তারের ঘরে নিয়ে আসতেই হয় কারণ তাকে ফিরিয়ে দিলেও ছটফট করে মরতে হবে এবাড়ির সবাইকে। কি বিপদ কোথা দিয়ে আসছে বোঝার আগেই অবিনাশ তাকে কত ভয়ঙ্কর মুখে করে ফেরত পাঠাবে প্রত্যাখ্যাত হবার প্রতিশোধ নিতে বলা অসম্ভব না হলেও শক্ত।

অবিনাশ ঘরে এসে ডাক্তারকে প্রশ্ন করে, কেমন আছেন চিন্তাহরণদা?

ডাক্তার অবিনাশের চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে বলেন, ভালো। কি মনে করে?

অবিনাশ এদিক-ওদিক তাকায়, তারপর বলে, চা হবে এক বাটি?

চায়ের অর্ডার দেন চিন্তাহরণ। অবিনাশ এখনও তেমনই

আছে তারপর অবিনাশ বরফ ভাঙে আস্তে আস্তে : কিছু খারাপ মনে করে আসিনি।

ডাক্তার কিছুমাত্র আশ্বস্ত হন না। বিষধর যদি কথা বলতে পারত তাহলে কামড়াবার আগে সে এমন করেই বলত হয়ত—কামড়াতে আসিনি আমি। তাই কণ্ঠস্বরের অব্যাহত কাঠিন্যে চিন্তাহরণ উচ্চারণ করলেন দুটি শব্দ : তবে ?

চায়ের কাপ থেকে প্রথম চুমুক তুলে অবিনাশ বলল, আপনি চুপচাপ বসে আছেন কেন ?

এদিক থেকে তীর আসতে পারে ভাবেননি চিন্তাহরণ : আমার কি করার আছে ?

কেন ? রাজশাহীতে যা করেছিলেন।

এখানে আমাকে ডাক্তার হিসেবে চেনে কে ? চিনলেই বা মানছে কে ? রোগী কোথায় ?

রাজশাহীতে কি আপনি ডাক্তারী করতেন ?

মুখচোখ লাল হয়ে যায় চিন্তাহরণ ডাক্তারের মুহূর্তে। ভুলে যান অবিনাশ বিষধর সাপ ; আক্রান্ত বাচ্চা সার্জারের মতো ফ্যাঁশ করে ওঠেন তিনি : অবিনাশ !

জাতসাপ অবিনাশ ফণা নামায়। নিম্নস্বরে বলে, মিছে রাগ করছেন চিন্তাহরণদা, ডাক্তার হয়ে পসার জমানোর মতো অর্থ এবং সামর্থ্য কোনটাই নেই আপনার, বয়সও নেই। কিন্তু যে রাস্তায় ঘরবাড়ি রাজশাহীতে করেছিলেন সেই রাস্তাতেই কলকাতায় আরও বড় বাড়ি গাড়ি করতে পারতেন এতদিনে। এখনও পারেন—এখনই পারেন।

এখনই ?

হ্যাঁ, সেই খবরই নিয়ে এসেছি।

মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া, অন্য শিকার ধরবার অযোগ্য

বয়সের কারণে, বৃদ্ধ বাঘের মতো জ্বলে ওঠে চিন্তাহরণের চোখ অনেকদিন বাদে।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না।—অবিনাশ বোঝে ওষুধ ধরেছে। আরও উদগ্র উৎসাহিত করতে ডাক্তারকে বলে, কোটিপতির কুমারী মেয়ে বিপদে পড়েছে, যদি পারেন তো মেয়ে নয় আপনি বিপদ থেকে বেঁচে যাবেন চিরদিনের মতো ; ললিতাকে চাকরি করে খাওয়াতে হবে না।

মোক্ষম ওষুধ পড়ে এতক্ষণে ; জোঁকের মুখে পড়ে নুন।

চিন্তাহরণ ডাক্তার চিন্তা করবার সময় পান না আর ; বলেন, যাবো।

॥ এগারো ॥

চিন্তাহরণ যে উৎসাহ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন গাড়িতে যেতে যেতে সে উৎসাহ রইলো না। এ্যাবসলুট এ্যালকোহল যেমন মুখ খোলা শিশির মুখ থেকে উবে যেতে থাকে মুহুর্মুহুঃ ; ধূপকাঠি যেমন জ্বলতে জ্বলতেই ছোট হতে থাকে অতি দ্রুত ; সূর্যের উদ্দাম আলোয় যেমন পাথরজমাট বরফের চাঁই জ্বলতে আর গলতে থাকে ঝলকে ঝলকে ; হতে থাকে শীতল বারি আবার, সিংহ যেন পুনর্মূষিক পুনরায় ;—তেমনই বাড়ির দিকে, সেই বাড়ি যা চিন্তাহরণের চিন্তা মুহূর্তে হরণ করতে পারে সত্যি সত্যি, দারিদ্র্যের দুঃসহ চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে এককালীন। গাড়ি যতই সেই সর্বচিন্তাহর গৃহের দিকে অগ্রসর হয় চিন্তাহরণ ততই কুঁকড়ে যেতে থাকেন, ডানলোপিলো গদির পাতালে প্রবেশ করতে থাকেন ততই। রাজশাহী থেকে সুরু করে ইদানীংকার সমস্ত অতীত অকস্মাৎ এসে দাঁড়ায় চিন্তাহরণের মনের চোখে। মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষের সমস্ত অতীত মনের পর্দায় বায়স্কোপের ছবির মতো ভেসে ওঠে। মৃত মানুষের মুখ থেকে নয়, মৃত্যুমুখে পতিত মানুষের

মুখ থেকেই এই অভিজ্ঞতা আহৃত। সেই কথা মনে হতেই চিন্তাহরণের মনের সমুদ্রে যে প্রশ্নের চোরা পাহাড় মাথা তোলে তা হচ্ছে তিনি কোনও ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছেন না তো!

মনে হতেই চিন্তাহরণ তাকালেন ড্রাইভারের মাথার ওপরে তেরচা দর্পণে; অবিনাশের মুখে কোন্ ভাবের অভিব্যক্তি আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলেন তিনি!

এতক্ষণে চিন্তার জাল ছিঁড়ে বাইরের লোকজন রাস্তাঘাট গাড়ির শব্দ চোখে এবং কানে এল তাঁর। যে গাড়িতে অবিনাশ তাঁকে নিয়ে চলেছিল সে গাড়িটাও ভালো করে এতক্ষণ নজর পড়েনি তাঁর। এতক্ষণে পড়লো। লেভারিড ড্রাইভার, দামী গাড়ি, লেফ্‌ট হ্যাণ্ড ড্রাইভ। রেডিও অত্যন্ত আস্তে খবর পড়ছে। কান পাতলেন চিন্তাহরণ। অবিনাশ বাড়িয়ে দিলেন বেতার কণ্ঠস্বর: আজ সকালে কাশ্মীরে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ধৃত হয়েছেন। তাঁকে অনির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে…

চিন্তাহরণ আবার ডুবে গেলেন চিন্তার অতলে।

রাজশাহীর ঐশ্বর্য থেকে কলকাতার দারিদ্র্যে অবতরণে দুঃসহ অন্তর্জ্বালায় জ্বলেছিলেন চিন্তাহরণ। বাড়ি, জুড়ি-গাড়ি, খানা-শিকার, লোক-লস্কর, মোসাহেবের স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়ে, মেসের রোজগারে একসময়ে অন্ন মুখে তুলতে কলকাতায় নিজের শেষ কাণাকড়ি ফুঁকে দেবার পর বাধ-বাধ লেগেছিল ঠিক। কিন্তু তবুও তা মেনে নিয়েছিলেন যে তার কারণ সুখের চেয়ে স্বস্তি অনেক কাম্য মনে হয় যে বয়সে সে ঝড় চলে গেলে নিজের ওপর দিয়ে, সেই বয়সে সেই অবস্থায় পদার্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

অবিনাশ স্তব্ধতার বরফ ভাঙল এক সময়ে: আর একটু ভাবুন দাদা; আর একটু পথ! আবার ঘুরে যাবে চাকা। মেয়ের টাকায় খেতে হবে না—

অন্ধকারে হঠাৎ খোলসমুক্ত তারে হাত দিয়ে দিলে বৈদ্যুতিক সাপের ছোবল সারা শরীরকে জানান দেয় মুহূর্তে, নড়ে যায় পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল, অবশ হয়ে যায় অঙ্গ চোখের পলক পড়বার কালটুকু, পৃথিবী থেমে যায় চলতে চলতে, অন্ধকার হয়ে যায় দিনের আলো যেমন তেমনই, 'মেয়ের টাকায় খেতে হবে না'—অবিনাশের অজান্তে, অথবা অবিনাশ সাংঘাতিক ঝানু; কোন্ ওষুধ কখন ধরে অব্যর্থ ডায়গনসিস তার নখদর্পণে—অবিনাশের ওই একটি সংক্ষিপ্ত অসমাপ্ত বাক্যে তেমনই সর্পদংশন জ্বালা জ্বলতে থাকে চিন্তাহরণের।

গাড়ি তার আগেই সেই বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, যে দরজায় অপেক্ষা করছে চিন্তাহরণের সব চিন্তা হরণের সোনার কাঠি।

দারোয়ান গাড়ির হর্ণ দূর থেকে শুনেই খুলে দিয়েছে গেট। বাড়ি নয়—প্রাসাদ। অবিনাশ তাকায় চিন্তাহরণের চোখে। তার কেবল নীরব বক্তব্য এই যে, কি, ঠিক বলেছিলাম কি না? দুঃখ দূর হয়ে যাবার মত জায়গায় নিয়ে এসেছি কি না? সত্যিই, স্বর্গের সিঁড়ির মুখে নিয়ে এসেছে চিন্তাহরণকে অবিনাশ। রাজশাহীর স্বর্গের চেয়ে অনেক বড় স্বর্গে হয়তো। কাঁপতে থাকে চিন্তাহরণের অন্তস্তল। হৃৎপিণ্ডের শব্দ বেরিয়ে পড়তে চায় বাইরে। বুকে হাত দিয়ে তাকে যেন ঠেকাবার চেষ্টা করেন চিন্তাহরণ।

যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন তাঁকে চিন্তাহরণ আগে দেখেননি; তিনিও চিন্তাহরণকে দেখেননি তাই। না হলে চিন্তাহরণকেও যেমন, তেমনি যাঁর কাছে এলেন চিন্তাহরণ এইমাত্র, তিনিও তেমনই ফেস করতে চাইতেন না কেউ কাউকে।

কারণ যাঁর কাছে এসেছেন চিন্তাহরণ তাঁর নাম সূর্যকান্ত দেব; যাঁর ছেলের সঙ্গে ললিতার বিবাহ-প্রস্তাব উপলক্ষ্যে পত্রে আলাপ

হয়েছে মাত্র পরস্পরের। এবং এমন লজ্জাজনক ব্যাপারে সাক্ষাৎ হয়েছে এইমাত্র যে কেউ কারুর পরিচয় জানতে বা দিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন, তাই।

অবিনাশ এদের ব্যাপার জানত না। কিংবা লোকটা যখন অবিনাশ, তখন বলা শক্ত অবিনাশ হয়তো জানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবিনাশ কেন দুজনের এই অপ্রীতিকর সাক্ষাৎকারের আয়োজন করল তা অবিনাশকে যারা জানে তাদের পক্ষেও বলা সহজ নয়।

দুজনে দুজনকে কোনও রকমে নমস্কার করবার পর সূর্যকান্তকে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার চিন্তাহরণ, মেয়েটি কোথায়?

সূর্যকান্ত কি ভাবছিলেন, তিনিই জানেন, বললেন: মেয়ে? কোন্ মেয়ে?

বিরক্ত হলেন চিন্তাহরণ নেকামিতে বিস্মিত হলেন এতদূর যে লোকটার মাথা চিন্তায় তাঁর চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে কি না ভাবলেন।

ইতিমধ্যে সূর্যকান্ত ভাবনার সমুদ্রগভীর থেকে ফিরে এসেছেন বর্তমানে তীরভূমিতে: অবিনাশের কাছে শুনেছেন তো সব?

সূর্যকান্তর প্রশ্ন করার নির্বিঘ্নতায় চিন্তাহরণ ডাক্তার বুঝলেন লোকটা পাগল হয়নি। পাগল হবার সম্ভাবনাও নেই কোনওদিন। কারণ এ সেয়ানা পাগল, জ্ঞানপাপী। কুমারী মেয়ের গর্ভে সন্তান আনার সর্বনাশ এর দ্বারা এই প্রথম সংঘটিত হয়নি। তাহলে এত ডাক্তার থাকতে চিন্তাহরণকে ডাকা কেন? এর উত্তর সম্ভবত এই যে, সেই সব ডাক্তারের কাছে আবার যাবার সংকোচ। কারণ পয়সার অভাব এর কারণ যে নয় তা বোঝা যায় ঘরের চেহারায়, ঘরের মালিকের কণ্ঠস্বরে। এত বড় পাপের পৌনঃপুনিকতায় যার কণ্ঠস্বর কথা বলতে এতটুকু কাঁপে না, তাঁর বিবেক নেই একথা যেমন সত্য, তাঁর পয়সা আছে, অজস্র, অঢেল, অফুরন্ত ধন যক্ষের,

একথাও তেমনই মিথ্যা নয়। তাহলে? সমস্ত ব্যাপারটাই অবিনাশের কারসাজি। নতুন করে কোনও বিপদের অতলে তলিয়ে দেবার মতলবেই নিশ্চয় চিন্তাহরণকে এখানে নিয়ে আসা অবিনাশের। তাহলে চিন্তাহরণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। চিন্তাহরণ আর ভাবতে পারেন না, এটুকু ভাবতেই কুঁকড়ে গুটিয়ে যায় যেটুকু উৎসাহ ফণা ধরেছিল তখনও হঠাৎ অর্থাগমের ঝলকানিতে।

অবিনাশ কথা বলে এতক্ষণ বাদেঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁকে সব বলেছি।

চিন্তাহরণ তৎক্ষণাৎ কিউ ধরে জবাব দেয়, সেই শুনেই জিজ্ঞেস করেছি, সেই মেয়েটি কোথায়?

তাই বলুন। অবিনাশ আপনাকে সব কথা বলেনি!

কি রকম?

অবিনাশ?

আজ্ঞে, মেয়েটিকে না দেখে ওষুধ দেওয়ার কথাটা আমি বলতে—

আসল কথাটা বলতেই যখন ভুলে গেছ, তখন কাজ হাসিলের পর তোমার বাকী প্রাপ্যের কথা যদি আমি বেমালুম ভুলে যাই?

ডাক্তারবাবু,—অবিনাশ আর্তনাদ করে ওঠেঃ এই বলছিলাম, মেয়েটাকে দেখবার দরকার আছে খুব?

কঠিন চোয়াল চিন্তাহরণের কঠিনতর হয়ঃ না, দরকার থাকবে কেন? এই ভদ্রলোককে ওষুধ দিলে সেই মেয়েটির পেট থেকে ছেলে খালাস হবে, এমন কথা ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে না। এর জন্যে পি. সি. সোরকারের কাছে যাওয়াই উচিত।

হাল ধরেন এবার সূর্যকান্ত স্বয়ংঃ কার কাছে যাওয়া উচিত সে ভাবনা আমার, মেয়েটিকে না দেখে ওষুধ দেবার জন্যে কত টাকা ফাউ নেবে তাই বলো।

নেবেন-এর বদলে নেবে এবং বলুন-এর বদলে বলো মার্ক করলেন চিন্তাহরণ। নিদারুণ ক্ষিপ্ত হলেন অনেক দিন বাদে। বিস্মৃত হলেন মুহূর্তের জন্যে যে তিনি কপর্দকশূন্য একদা চিকিৎসক, মেয়ের রোজগার সম্বল বর্তমানে; আর যার ওপর রাগ করেছেন তার টাকার অন্ধি-সন্ধি নেই। তবুও সেকথা অস্বীকার করতে চাইলেন চিন্তাহরণ: আপনি আমাকে তুমি করে কথা বলছেন কেন?

সূর্যকান্ত আবার হাসলেন—অনেক টাকা থাকলে লোকের সেন্টিমেন্টের মুখের ওপর যে হাসি হাসা যায় অনায়াসেই। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন, তুমি বলবার জন্যেও তোকে না হয় আর কিছু ধরে দেব।

ডাক্তার এতক্ষণে বুঝলেন সূর্যকান্ত রঙে আছেন। ডাক্তারের সঙ্গে হিউমার করছেন।

মেয়েটিকে কতগুলো প্রশ্ন করা দরকার।—চিন্তাহরণ ঈষৎ ধাতস্থ-কণ্ঠে।

আমাকেই করো।

চিন্তাহরণ ভুরু কুঁচকোলেন। সূর্যকান্তর এটাও হিউমার, না, সিয়েরিয়াস সাজেশচান কে জানে!

আপনি সে প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি করে?

তবে কে দেবে?

যার জ্বালা সেই।

জ্বালা তো আমার! কি জ্বালা জানেন?

অবিনাশ বলেছে।

কচু বলেছে। অবিনাশ জানেই না তো বলবে কি?

চিন্তাহরণের চোখে মুখে এবার সত্যি সত্যি ছায়া পড়ে। সূর্যকান্ত চুর হয়েছে মাল খেয়ে, চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়বার অপেক্ষা। ওকে আর কোনও কথা, একটি অতিরিক্ত কথাও জিজ্ঞেস করার

মানে হবে না, চিন্তাহরণ তা বুঝলেন। কিন্তু সূর্যকান্ত তা বুঝেছেন বলে মনে হল না। কারণ সিগারেটের ঠোঁটে আগুনের মতো, সূর্যকান্তর ওষ্ঠে আবার সেই ব্যঙ্গের হাসি জ্বলে উঠলো। যে হাসি শিকারী বিড়াল গোঁফের ফাঁকে হাসে ইঁদুর দেখে।

চিন্তাহরণকে এবারে যে গলায় প্রশ্ন করলেন সূর্যকান্ত, সে গলা মাতালের নয়, সেয়ানা জ্ঞানপাপীর। মুখোসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক জমিদার। ঝোপের আড়াল থেকে রয়্যাল বেঙ্গল। পুরো ফিগারের বিস্ময়কর মহিমায় এসে দাঁড়ালো শিকারের মুখোমুখি।

তুমি আমার নাম জান না এবং ভেবেছ আমিও তোমার না, কিন্তু তোমার নাম আমি জানি—চিন্তাহরণ ডাক্তার। আমার নাম—সূর্যকান্ত দেব।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন চিন্তাহরণ।

বসো বসো, অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই।

চন্দ্রকান্ত আপনার ছেলে ?

একমাত্র সন্তান। তাকেই তোমাকে রেহাই দেবার জন্যে ডেকেছি।

চিন্তাহরণের অ কাটেনি তখনও। তাই দেখে সূর্যকান্তই আবার প্রশ্ন করেন ঃ কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? চিন্তাহরণ তবুও রা কাড়েন না ; সূর্যকান্ত মুখ খোলেন আবার ঃ এটা অন্তত বিশ্বাস করতে পার, মেয়েছেলের ব্যাপার থেকে রেহাই পাবার জন্যে কোলকাতায় ডাক্তারের অভাব নেই, তাদের অনেষ্ট [!] খাঁই মটাবার মতো অর্থের অভাবও আমার এখনও হয়নি।

কিন্তু অবিনাশ—

অবিনাশ আমার কথামতোই তোমায় ওই কথা বলে এখানে এনেছে।

এবার বোঝেন চিন্তাহরণ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আশ্বস্ত করেন

সূর্যকান্ত : টাকা তুমি পাবে। তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েও উদ্বৃত্ত থাকবে এমন টাকাই তুমি পাবে। শুধু আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে না, এটা চন্দ্রকান্তকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

সে যদি না বোঝে ?

বুঝবে সে না, তা আমি জানি। আর তার জন্যেই তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে যত শীগগির সম্ভব।

পাত্র কোথায় পাচ্ছি ?

না পেলে গড়িয়ে দেবে পাত্র। এই অবিনাশই—কি হে অবিনাশচন্দ্র, পারবে না ?

অবিনাশ গদগদ হয়ে ওঠে : আপনার হুকুম পেলে—

কথা শেষ করতে দেন না সূর্যকান্ত। বাজিকররা যেমন হাতের ইসারায় উড়িয়ে দেয় তাস, তেমনই একটা ভঙ্গীতে নস্যাৎ করে দেন অবিনাশের উদ্যত খোসামুদিকে : আমার হুকুম পেলে তুমি চন্দ্রকান্তর বদলে সূর্যকান্তর সঙ্গেই চিন্তাহরণের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে পার, এই তো ?

কথাটা কোনওরকমে শেষ করেই ছাদ ফাটানো হাসি হাসলেন সূর্যকান্ত দেব। সাংঘাতিক রসিকতা করার আত্মতৃপ্তিতে দুটো চোখ ডুবে গেল তাঁর ভারী গালের ডানলোপিলো ডিভানে।

না অতটার দরকার নেই। তার চেয়ে অবিনাশ তুমি একটি ভালো বংশের ভালো ছেলে দেখ, যত টাকা লাগে বিয়ের খরচা আমি দেব।

চিন্তাহরণ ডাক্তার কি বলবেন ভেবে পেলেন না। অবিনাশ আমতা আমতা করে : ছেলে তো পাওয়া যায়, ভাল ছেলে, খুব ভাল বংশের ছেলের খবর আমার হাতে আছে। কিন্তু—

কিন্তু কি ? ওই সব্বনেশে চিঠি তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

ওই চিঠির জন্যেই চন্দ্রকান্তর সঙ্গেও বিয়ে আটকাচ্ছে। চন্দ্রকান্ত ওই মেয়েটিকে বিয়ে করবেই, আর চন্দ্রকান্তর মা এ বিয়ে কিছুতেই হতে দেবে না।

তাহলে উপায় ?

উপায় এমন একটি ছেলের সন্ধান করা যাতে চিঠি পেলেও সে বিয়ে করতে আপত্তি না করে।

বুঝেছি।

কি ?

টাকা দিয়ে তার না-মুখ বন্ধ করা।

হঠাৎ চিন্তাহরণের মধ্যে সুদীর্ঘকাল সুপ্ত মনুষ্যত্ব ফণা ধরে সূর্যকান্ত দেবের মুখের ওপরই : টাকার প্রয়োজন নেই। আমি কথা দিচ্ছি আপনার ছেলের সঙ্গে ললিতার বিয়ে হবে না কোনও দিন, আর যার সঙ্গেই বিয়ে হোক তার।

মুহূর্তের জন্য হতবাক সূর্যকান্তকে বাক্যস্ফূর্তির সময় না দিয়েই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে একেবারে রাস্তায় এসে পড়েন চিন্তাহরণ ডাক্তার। সূর্যকান্তর নির্দেশে অবিনাশ বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হন। অবিনাশের চীৎকার : গাড়িতে করে আপনাকে পৌঁছে দিতে বলছেন রাজাবাহাদুর।

এর মুখের ওপরই হাত নেড়ে দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেন চিন্তাহরণ ডাক্তার। সে হাঁটা কোনওদিন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল শুনলে যে কেউ অবিশ্বাস করবে। আজকে বেরুবার আগে পর্যন্ত দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী, তারপরে ঘরের মধ্যেই কোনরকমে ঘোরাফেরা করতেন। এত জোর তাঁর গলায় এবং তারপর তাঁর চলায় সঞ্চারিত হল কখন তা নিজেও জানেন না।

দুর্বার গতিবেগ আহত হল মধ্যপথে আবার। চন্দ্রকান্ত দাঁড়িয়ে।

বাবা ডেকেছিলেন বুঝি ?

না বলে দিয়েছি। তোমার সঙ্গে ললিতার বিয়ে হবে না।

চন্দ্রকান্ত বুঝলেন চিন্তাহরণের বুকে উত্তেজনার ঝড় বইছে। চন্দ্রকান্ত যা জিজ্ঞেস করেননি চিন্তাহরণ তার জবাবও দিয়ে দিলেন। চন্দ্রকান্ত আর কথা বললেন না, চিন্তাহরণও না।

বাড়ি এসে পেঁছতেই দেখেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী বসে আছেন।

ললিতার জন্যে নূতন পাত্রের খবর এনেছেন তিনি। পাত্রের নাম সুনির্মল রায়।

ললিতা তখন বাড়ি ছিল না। বাসে দেখা হয়েছিল প্রায় একযুগ পরে কলেজ ডেসের অন্তরঙ্গ ক্ষমার সঙ্গে। বাসে জড়িয়ে ধরেছিল ললিতাকে। সরু পাড় সাদা কাপড়ে মাথায় ঘোমটা দেওয়া ক্ষমাকে চিনতে দেরী হয়েছিল ললিতার। ক্ষমার দেরী হয়নি এক মুহূর্তও।

ললি, এখনও বিয়ে করিসনি দেখছি !

ললিতা জিজ্ঞেস করল, তুই ?

বিয়ে ? প্রথম মেয়েটা এখন ক্লাস নাইনে পড়ে, জানিস ? তোকে বিয়ের সময় কত খুঁজেছি। কোথায় ছিলি ?

স্বামী কি করেন ? ললিতা প্রশ্ন করে অন্যমনস্ক ভাবে।

নেই।

মানে ?

ক্ষমা সরু পাড় সাদা কাপড় দেখায়। ললিতা লজ্জিত হয়। ক্ষমা বিন্দুমাত্র নয়। তাতেই ললিতা লজ্জা পায় আরও বেশী।

ক্ষমার নামার জায়গা এসে যায়।

চল ললি, আমার জায়গা এসে গেছে।

আমি ? কাজ ছিল যে !

ঢের বড় কাজ হবে আমার সঙ্গে গেলে। সারাদিন থাকবি, সেই সন্ধ্যেয় ফিরবি।

কিন্তু—

কিন্তু শুনল না ক্ষমা। ললিতাকে নিয়ে গেল ধরে। বাস থেকে নেমেই বলল, আমার বিয়ে হয়েছে শুনে মন খারাপ হয়ে গেল তোর?

না রে! বিধবা হয়েছিস শুনেই বরং—

প্রকাশ্য দিবালোকে দারুণ ভিড়ের রাস্তায় আকাশ-নামানো হাসিতে ক্ষমার চারদিকের লোকজন চমকে তাকাল তুটি মেয়ের দিকে ললিতা অপ্রস্তুত এবং বিস্মিত হল।

বিয়েই হয়নি আমার, বিধবা কি রে? আমার এই চেহারায় বিয়ে করবে কে?

ললিতা খুব আস্তে বলল, সেই একই রকম আছিস!

একই রকম থাকব, দেখে নিস। বিয়েও হবে না, স্কুলে মাস্টারিও করে যেতে হবে।

ক্ষমা থাকে তার বড় ভায়ের সরকারী কোয়ার্টার্সে। আপার ডিভিসন ক্লার্ক। বউ আর তিন মেয়ে তার, বিধবা মা, ছোট ভায়ের বউ এবং একটা বাচ্চা, আর বিবাহিত এক বোন থাকে সেই আড়াইখানা ঘরের সরকারী খোঁয়াড়ে। ক্ষমাও থাকতে বাধ্য হয় সেখানে। দমদমে স্কুল-মাস্টারি করে। আসা-যাওয়ার পথে সাংঘাতিক উজান ঠেলে রোজ তিরিশের আগেই তাকে চল্লিশ ছোঁব ছোঁব করছে মনে হয়।

তিনতলার ফ্ল্যাট। ক্ষমার পেছন পেছন ললিতা বলে আর একজন বাইরের লোক যে আসছে টের পায়নি বাড়ির লোক। বড় ভাইঝি দরজা খুলেই ছেঁড়া একটা খাতা দেখিয়ে বলে, পিসা, এই দেখ ছিঁড়েছে—পরীক্ষার খাতা স্কুলের। ছিঁড়ে ফেলেছে মেজ ভাইঝি। ক্ষমা ভুলে গেল যে দীর্ঘ দিন পরে ললিতা, তার কলেজ ডে-র ললি, আজ এসেছে ক্ষমার বাড়িতে। ভুলে গেল যে মেজ বউ বাড়িতে। কানটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনল

পরীক্ষার খাতা ছেঁড়া বাচ্চাটার। সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল তিনতলার সরকারী ফ্ল্যাটে। মেজ ভায়ের বউ সাত পাড়া জাগানো গলায় বলল, এবার আমাকে এক ঘা আর বুড়ি মাকে একটা ঠেলা দাও, ওঁর যা বয়স আর তোমার যা গতর, এক ঠেলাতেই সব যন্ত্রণা শেষ হবে। তুমি বাঁচবে।

উত্তরে ক্ষমার মুখ দিয়ে প্রথম যা বেরুলো তা কান্না, না, আর্তনাদ, না তিরস্কার ললিতার পক্ষে বলা শক্ত। একটু বাদে ললিতা শুনল ক্ষমা বলছে, চাকরি করে খেতে হলে ওই খাতার দাম তুমি বুঝতে।

বাচ্চাকে আক্রমণে উদ্যত হলে মার্জারজননী যেমন নখ বার করে তার চেয়েও বিষাক্ত জিব মেজ বউয়ের উদ্‌গিরণ করল যে বস্তু তাব সঙ্গে তুলনা চলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের সঙ্গে নয়। তার সঙ্গে উপমিত হতে পারে কেবল পাখী জবাই করার সঙ্গে। ক্ষমার কথা ভাল করে শেষ হবার আগেই মেজ বউ জবাব দিল সে কথার। সে জবাব যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনই বিছুটির জ্বালা সে কথায়। মেজ বউ বলল কোল্ড ব্রাডেড মার্জরারের অনুত্তেজিত আস্পর্ধায়ঃ চাকরি করলে ভায়ের ঘাড়ে বসে নয়, নিজের ঘরে বসেই খেতাম।

ক্ষমা কি বলবে মুহূর্তটাকে ভেবে পেল না। তার আগেই কলঘর থেকে বেরিয়ে এল মেজ ভাই। তার হাতে বউয়ের একগাদা শাড়ি, বডিস, শায়া। এতক্ষণ ধরে কাচছিল সে। মেজ ভাই রঞ্জিত যে বাড়ি ছিল ক্ষমার তা স্ট্রাইকই করেনি। করার কারণও ছিল না। সেদিন ছুটি অথবা রবিবার নয়। রঞ্জিত ছুটি নিয়েছিল কেন সে আর তার বউ জানে। দুজনে মুখোমুখি গভীর সুখে সুখী এমন দুটি মানুষের কথা উপন্যাসেও অচল। রঞ্জিত হাতে বউয়ের কাচা কাপড় নিয়ে বেরিয়েই বলল, বাড়ি আসতে না আসতেই বাধাতে পেরেছ তো একটা গোলমাল

আমি গোলমাল বাধিয়েছি ?

না না, তুমি কেন ? গোলমালের কারণ তো আমিই বটে। সরকার ফ্ল্যাট দিয়েছে, সে ফ্ল্যাট তোমার জন্যে ছেড়ে না দিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে এখনও কেন না হলে আমি আছি এখানে। আমার বাচ্চা যখন তোমার খাতার পাতা ছিঁড়েছে তখন সেই বাচ্চার বাপ হিসেবে সব গণ্ডগোলের মূলে তো আমি। তা ওকে না মেরে আমার গালে চড় দিলে না কেন ?

মেজ বউ হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল অপরাধীকে। তারপর ক্ষমার দিকে মেয়েটাকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, গলা টিপে একেবারে শেষ করে দাও—আর কোনও দিন তোমার খাতা ছিঁড়বে না।

ললিতা শরৎচন্দ্র পড়ে হাসত এতকাল। এখন থেকে আর তেমন হাসতে পারবে বলে মনে হল না তার।

ক্ষমা বিয়ে না করে চাকরি করে ভাইদের মানুষ করেছে অনেককাল। বিশেষ করে মেজ এবং ছোট ভাইয়ের লেখাপড়া থেকে, ছোট ভায়ের বাইরে যাওয়ার পেছনে এ বাড়িতে ক্ষমার স্বার্থত্যাগ সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে বেশি বঞ্চনা তাই তার ভাগ্যেই জুটেছে। প্রাতঃস্মরণীয় নয় ক্ষমা। তাই তার বঞ্চিত হবার খবর কোনওদিন ঘরোয়া কথা হবে না। কিন্তু সে বিয়ে না করে চাকরি করেছে বলেই মেজ ভাই আজ সরকারী চাকুরে হতে পেরেছে। ছোট ভাই যেতে পেরেছে বিদেশে। সমস্ত সংসারটা দাঁড়িয়েছে তারই পায়ে। বাবা কোনওদিন রোজগার করেননি। ছোট্ট একটুকরো জমিদারী ছিল। নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। তবু সেদিন সেই জমির খাজনা থেকেই চলেছে সংসারের চাকা। দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর উত্তরবঙ্গ থেকে চলে এসেছে সবাই। আর ক্ষমা গিয়ে ঢুকেছে স্কুলমাষ্টারণীদের খোঁয়াড়ে।

আজকে ক্ষমার রোজগারের ক্ষমতা এসেছে কমে। ভাইরা

মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। বাবা নেই। ক্ষমার শরীরে দেখা দিয়েছে বিষণ্ণ মনের আর অবসন্ন শরীরের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। আধিব্যাধির অন্ত নেই। শেষবিন্দু রস নিংড়ে নেবার পর আখের ছিবড়ের মতো ক্ষমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ললিতার যাবার আগে ক্ষমা কেবল তাকে বলল, বিয়ে কর ললি। বিয়ে না করে চাকরি করে যাদের দাঁড় করাচ্ছিস, তারা কেউ দেখবে না। ভাই না, বাবা না। যখন তোর শরীরের জোর কমে যাবে, চাকরি করার ক্ষমতা আসবে কমে, তখন দেখবি ভায়ের সংসারে তুই বাহুল্য। আমার ইচ্ছে থাকলেও কোনওদিন বিয়ে হত না, কারণ আমি বড়লোকের কুরূপা বা গরীবের ঘরে পদ্মফুল নই। আমি রিফিউজি এবং আগ্‌লি। চাকরি করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। কিন্তু তোর চেহারা এত অন্ধকার নয়,—তুই এখনও ঝলমল করে উঠতে পারিস। তুই বিয়ে কর ললি।

বাড়ি ফিরতেই ললিতা দেখলো আবার আরম্ভ হয়েছে বিবাহের উদ্যোগ পর্ব। এবারের ক্রেতার নাম সুনির্মল রায়।

সুনির্মল রায় এক অ্যাবসার্ড ক্যারেক্টার। পুরোপুরি ক্যাপ্টেন চৌধুরীর আবিষ্কার। সত্যি কথা বলতে ললিতার কাহিনী বলতে গিয়ে সুনির্মলের কথা যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি বলা যাবে না তাই, না হলে সুনির্মলের কথা অমৃতসমান না হলেও মহাভারত-প্রমাণ বটে। সুনির্মল জুনিয়ার এক্সকুটিভ মস্ত বড় সওদাগরি অফিসে। মাইনে বিবাহিত জীবনের পক্ষে শুধু যথেষ্ট বলে এবং যথেষ্টের বেশি নয় বলে বিয়ে করেনি এতকাল। ক্যাপ্টেন চৌধুরী এই কাজটা পাবার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন এই মাত্র। সুনির্মল তার জন্যে চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ। আজকের অভিধানে সুনির্মল নিশ্চয়ই বোকা। এই বোকার কাছেই ক্যাপ্টেন চৌধুরী গেলেন।

সুনির্মল রায় ব্যাচেলার বটে, তবে সে ব্যাচেলার নয়। ঘরে বাইরে তার কাউকে ভাল লাগে না। সবকিছুই অর্থহীন একঘেয়ে। সুন্দর চেহারা, ভালো চাকরি, ব্যাচেলার জীবন, কিছুই ভালো না লাগার মূলে কোনও মনের অসুখ নেই। আছে বই পড়ার ব্যারাম। খুব অল্প বয়সে সে ইংরেজি বই পড়তে শুরু করে কারণ বাঙালীরা অনেক বয়সেও ইংরেজি বই দেখলেই সাত হাত পিছোয়। সেই সব বই সে এমন বয়সে পড়ে যখন উপন্যাসের নায়ক হবার রং ভয়ঙ্কর সহজে মনে ধরে যায়। সুকুমারমতি বালকরা বোঝে না যে জীবনের নায়ক আর উপন্যাসের নায়ক এক নয়। জীবনে উপন্যাসের নায়ক হতে হলে যে রকম অ্যাবসার্ড হতে হয় সুনির্মল ততদূর, তার চেয়েও বেশি কিম্ভূতকিমাকার সাজতে এতটুকু লজ্জা পায় না। খুব কালো রোগা হাড়কণ্ঠা বাঙালী মেয়েও এখন উজ্জ্বল রংয়ের বুক, বগল, কোমর-কাটা জামাকাপড়, ঠোঁটে কড়া রং ব্যবহার করতে এবং গালে চুনকাম করতে আর পিছোয় না যেমন আজকাল, তেমনই।

একেবারে আরম্ভে সে একটি মেয়েকে ভালো লাগিয়েছিল নিজেকে। প্রথম দিনেই বিবাহের করেছিল প্রস্তাব। করেছিল তার কারণ এরকম করাটা রেওয়াজ নয়। বাড়িতে এসে বললে সুনির্মল যে সে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। বাবা বললেন, বেশ ভাল কথা। মা-ও সেকেণ্ড করলেন সে প্রপোস্যাল। দাদা বউদিরা কোনও কথা বলল না; সুনির্মল আহত হলো। তার বিয়েতে বাড়িসুদ্ধ লোক আপত্তি করবে, সাংঘাতিক আলোড়ন উঠবে আত্মীয়মহলে এই আশা তামাসায় পর্যবসিত হওয়ায় সে মেয়েটিকে গিয়ে বলল, সে বিয়ে করতে পারবে না তাকে। এবং যেহেতু একটি মেয়ে তার প্রতীক্ষায় থেকে জীবন নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছে, সেহেতু সুনির্মলও সারা জীবন বিয়ে করবে না। মেয়েটি প্রথম দিনেও যেমন এদিনেও তেমনই চুপ করে রইলো। বলবার

সময় বা সাহস পেল না যে, তার বিয়ে অনেকদিন ঠিক হয়ে আছে।

বাড়ি এসে সে একজন ইংরেজ লেখকের বই নিয়ে বসল, যে লেখক দু বছর সভ্যতা থেকে অনেক দূরে এক ব্রজ গ্রামে এক পুকুরের ধারে বসে কাটিয়েছেন। সুনির্মলও বাড়ি ঘরদোর বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে গিয়ে উঠল কলকাতার কাছেই কমলগাছি বলে একটা জায়গায়। অফিস থেকে লোক এলো বাড়িতে। স্পেশাল মেসেঞ্জার। বাড়ির লোকরা বলতে পারল না সুনির্মল কোথায়। দুদিন বাদে ফিরে এলো যে বাড়িতে তাকে দেখে চেনা যায় না সুনির্মল বলে। মশা কামড়ে মুখ-হাত পা সব ফুলিয়ে ঢোল করে ছেড়ে দিয়েছে হ্যাণ্ডসাম লম্বা ফিগার সুনির্মল রায়ের।

বাড়ি ফিরে দু হপ্তা মশারীর মধ্যে খেতে লাগল সে।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী সব খবরই রাখতেন সুনির্মলের। সুনির্মলকে গিয়ে ব্যাপারটা বলতে, হি জাম্প্‌ড্‌ অ্যাট ইট। এতদিনে উপন্যাসের নায়ক হবার মত একটা কাণ্ড ঘটলো বটে জীবনে। ভগবানকে নয়, নিজেকে ধন্যবাদ দিল সুনির্মল। ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়াটা ভারি কন্‌ভেনশ্যানাল।

একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না উড়ো চিঠির জন্যে,—সুনির্মলের কাছে এইটুকুই এতদূর অ্যাডভেঞ্চারাস যে এর জন্যে সুনির্মল বিয়ে করেও ফেলতে পারত সেই মেয়েকেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন চৌধুরী তাকে বিয়ে করার বদলে বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া আইবুড়ো পালার শেষ অঙ্কে অভিনয় করতে বললেন কেবল। সুনির্মলের কাছে এটা আরও উত্তেজক আহ্বান। বিয়ে করতে হবে না অথচ সে বিয়ে করতে যাচ্ছে, এ খবরে ঘরেবাইরে কি রিয়্যাকশান হতে পারে তা প্রত্যক্ষ করবার এমন সুযোগ উপন্যাসেই কজন পায়? সুনির্মল র‍্যাল লাইফেই সে নিষিদ্ধ অ্যাডভেঞ্চারের আসন্ন রোমান্সে নিদারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ঘরেবাইরে যে দেখে সেই অবাক

হয় সদাবিষণ্ণ সুনির্মলকে খুশিতে উপছে উঠতে দেখে। গাঁদাফুলের গায়ে কামিনীফুলের সৌরভ বিস্মিত বিহ্বল করে দিল অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ মহলকে একই সঙ্গে।

সুনির্মল, অ্যাস পার ক্যাপ্টেন চৌধুরীস অ্যাডভাইস, বাড়িতে চায়ের টেবলে জানালে সে বিয়ে করবে বলে ক্যাপ্টন চৌধুরীকে কথা দিয়েছে। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল সে ঃ তোমার মুখচোখ ওরকম হচ্ছে কেন? বিয়ে তো করব আমি। বিজাত-কুজাত নয়; পাল্টা ঘর। আমার নির্বাচন নয়; ক্যাপ্টেন চৌধুরীর ক্যাণ্ডিডেট।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী, সুনির্মলের ইনস্ট্রাকশান পার, সেই সময়েই এলেন সুনির্মলের বাড়িতে। না সোজা চায়ের টেবলে। এ বাড়িতে তাঁর গতিবিধি নদীর সমুদ্রে গড়াবার চেয়েও অবাধ।

এসেই বললেন, সুখবর দিই একটা। সুনির্মলের জন্যে পাত্রী পেয়েছি।

সুনির্মলের বাবা রিটায়ার্ড প্রিন্সিপ্যাল, ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করলেন, সুনির্মল বলেছে।

ওহ! ব্রোকেন দ্য আইস ওলরেডি? বাহাদুর ভাই!

কিন্তু বাবা ভয় পেয়েছেন, তাকিয়ে দেখুন, অ্যাস ইফ আয়াম গোয়িং টু মার্ডার—

সুনির্মলের মা চায়ের কাপটা ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ভূতের মুখে রামনাম শুনলে লোকে একটু ভয়ই পায়।

আমি ভূত? সুনির্মল মুখখানাকে যতদূর সম্ভব করুণ করে।

না। অদ্ভুত! ক্যাপ্টেন চৌধুরীর ঠোঁটে কৌতুক উপছে পড়ে। পেয়ালা থেকে প্লেটে উপছে পড়ে চা।

মেয়ে কি করে? পড়ে?

না। চাকরি করে।

সেকি! বিয়ের পরেও চাকরি করবে নাকি?

আপত্তি করলে আপনারা সুনির্মলের চাকরি করবে।

ছেলেদের কোন্ ব্যাপারে কবে আপত্তি করলাম?

ম্লান ছায়া পড়ে সুনির্মলের মায়ের ভারি সুন্দর মুখে। বিষণ্ণতার আভায় সে মুখ আরও আশ্চর্য ভাল দেখায়।

সুনির্মলের বাবার দিকে এবার ক্যাপ্টেন চৌধুরী মুখ ঘোরান: পাত্রীপক্ষ থেকে মেয়ের কাকারা আসবেন আজকালের মধ্যেই। সময় এবং তারিখ আমি তুই জানিয়ে যাব ঠিক সময়ে। ডোণ্ট ওরি।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী বেরিয়ে গেলেন। রবিবারে তাঁর ব্যস্ততা বেশি।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী বেরিয়ে যাবার দশ মিনিট বাদে ঘরে ঢুকল সুমি। সুমিতা, সুনির্মলের বোন। একা নয়, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আরেকটি মেয়েকে। সুমিতার চেয়ে বড়। সুমিতা তাকে একেবারে খাবার ঘরে এনে হাজির করল। তাকে দেখেই সুনির্মল উঠে যেতে পা বাড়িয়েছিল, সুমি তাকে বাধা দিল: ওকি, তুমি উঠে যাচ্ছ কেন? তোমাকে দেখবার জন্যে তো আমার বন্ধু এসেছে এখানে।

আমাকে দেখবার জন্যে? কেন? আমি 'প্রতিভা'ও নই, পাগলও নই।

নতুন মেয়েটি দারুণ সপ্রতিভ। সুমি কিছু বলবার আগেই তার গলা শোনা গেল: প্রতিভাবান লোক বা পাগল ছাড়া আর কাউকে বুঝি দেখতে ইচ্ছে করে না?

যাদের করে, আমি তো তাদেরও কেউ নই!

তারা কারা, শুনতে পাই?

তারা হয় ফিল্মস্টার, নয় সংস্টার!

আপনি জানেন না, কোনও কোনও মেয়ে এ ছাড়াও আর কিছু দেখতে চায়।

কে বললে জানি না? জানি। চিড়িয়াখানার আজব জীবকে টিকিট কেটে দেখতে যায় লোকে।

টিকিট কেটেই এসেছি। এই দেখুন না—

বাসের টিকিটটা দেখায় নবাগতা। তারপর বলে: কিন্তু আপনাকে দেখতে আসি নি, দেখতে এসেছি সুমির মুখে আপনার কথা শুনে। আপনার মাকে—তিনি কি করে আপনার মতো ছেলে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সংসার করছেন।

সুমিতার মা ঘরে ঢুকতেই সুমিতা বলে, মা, আমার বন্ধু—

মেয়েটি প্রণাম করে। সুমিতার মা জিজ্ঞেস করেন: কি পড়ছ তুমি?

উত্তর আসে: পড়ি না, চাকরি করি।

সুনির্মল চুপ করে থাকতে পারে না আর: চাকরি করেন? সখের চাকরি বুঝি?

মেয়েটি হেসে ফেলে: দারুণ সখের। বাবা অসুস্থ, ভাই বেকার, এইটুকু সখ না করলে—

সুনির্মলের মা থামিয়ে দেন: ওর কথায় কিছু মনে করো না মা। ওর কথাবার্তার ধারাই এই। তুই যা না সুমু, যে কাজে যাচ্ছিলি। জ্বালাস নে আর।

তারপর সুমিতাকে জিজ্ঞেস করেন: তোর বন্ধুর নামই তো বলিস নি এখনো। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়া হয়ে গেল যে।

আমার নাম, ললিতা।

পঞ্চপাণ্ডবকে দূর থেকে আসতে দেখে প্রমাদ গণেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী। রবি ঠাকুর আওড়ান ঈষৎ আওয়াজ করে। ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে—

কি ব্যাপার, একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন সবাই। যুদ্ধ করতে না কি?

না না, যুদ্ধ করতে কেন?

লজ্জিত হয় পঞ্চপাণ্ডব। বোঝে, একটু বেশি হৈ হৈ করে এসে পড়া গেছে।

তবে? ক্যাপ্টেন চৌধুরীর চোখে কৌতুক উপচে পড়ে। তারপর আবার বলেন নিজেই: দাঁড়ান, তবের উত্তর পরে হবে, আগে চা-টা কিছু হোক।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব বলেন: চা খেয়ে এসেছি এই মাত্তর।

অধিকন্তু ন দোষায়—

এত বেলায়?

এনি টাইম ইস টি টাইম।

আপনার সঙ্গে কথায় পারা অসম্ভব।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী তাঁর বেয়ারাকে চা আনতে বলে সবকটি পাণ্ডব আর নিজের জন্যেও। চায়ের সঙ্গে 'টা'-এর কথা বলতে হয় না। আনন্দ বেয়ারা ক্যাপ্টেন চৌধুরীর অতি পুরাতন ভৃত্য।

পঞ্চপাণ্ডব যা বলতে এসেছিল তা বলতে দেন না ক্যাপ্টেন চৌধুরী: ললিতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে শুনেছেন তো? দিনও ঠিক হয়ে গেছে।

হ্যাঁ। সতেরই অঘ্রাণ। কিন্তু—

No কিন্তু। এবার সেই উড়ো চিঠি আসবে না আর।

আপনি কি করে এত জোর দিচ্ছেন?

না। উড়ো চিঠি আসা না আসার ওপর জোর দিচ্ছি না।

তবে?

সতেরই অঘ্রাণের ওপরে জোর দিচ্ছি।

মানে?

ওই তারিখে এবার ললিতার বিয়ে হবেই

যদি চিঠি আসে ?

তাহলেও হবে।

পাত্র রাজি হবে কেন ?

পাত্র আমার প্রিয়পাত্র। উড়ো চিঠির দাম তার কাছে এক কানাকড়িও নয়।

তার বাড়ির লোক—

ঝড়ের আগে থমথম করে ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মুখ : সেই নোংরা চিঠিটা এলেই আপনারা যেন খুশী হন মনে হচ্ছে!

জিব কাটেন মেয়েদের মত মধ্যম পাণ্ডব : ছি ছি, কি যে বলেন—

কেন ? সে চিঠি আসবেই আপনারা এত সিওর হচ্ছেন কি করে ?

সেই কথা বলতেই তো আসা।

বলুন, সে কথাটা শুনে হোল মর্ণিং নষ্ট হবে বলে শুনতে চাইছিলাম না। বলুন সেই কথাই শুনি আগে।

তুমি বল দাদা,—জ্যেষ্ঠকে বাকী পাণ্ডবরা ঠেলে দেয় তোপের মুখে।

না না, মেজো বলুক—

মেজো একটি কথাও বলবে না বড় এবং ছোটরা থাকতে।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী বিরক্ত হন : বলবার থাকে তো মরদের মত মুখের ওপর বলে ফেলুন। আর নাহলে ডোণ্ট ওয়েস্ট মাই টাইম!

এ চিঠি লিখেছে—

ঘরের মধ্যে সুতো উড়লেও টের পাওয়া যায় তার অদৃশ্য পাখার সঞ্চালন শব্দ।

এ চিঠি লিখেছে কে ?—ক্যাপ্টেন চৌধুরী গর্জন করে ওঠেন।

এ চিঠি লিখেছে ললিতা।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী চুপ করে যান একটু। প্রচণ্ড বেগে ফেটে পড়বার মুহূর্তে পেছন থেকে কণ্ঠনালি চেপে ধরলে লোকে যেমন হকচকিয়ে যায় প্রথমে, তারপর চেষ্টা করে হাত ছাড়াবার; কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তেজনার জোয়ার হয় ঈষৎ মন্দীভূত, পঞ্চপাণ্ডবের কথাতেও তাই হল ক্যাপ্টেন চৌধুরীর। ললিতাই চিঠির লেখক শুনে পঞ্চপাণ্ডবদের ওপর পুঞ্জীভূত রাগ ফেটে পড়তে পড়তে একটু ঠেকে গেল। থেমে গেলেন চৌধুরী। তারপর পঞ্চপাণ্ডবের বক্তব্যের জট ছাড়াতে বসলেন: কি প্রমাণ পেলেন তার?

অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি।

কি রকম?

ললিতার শরীরের এই চিহ্নের কথাটা দুজন জানে এ পৃথিবীতে।

কে তারা?

এক, ললিতা নিজে; দুই, ললিতার মা।

বেশ, তারপর?

ললিতার মায়ের পক্ষে—সে কারুর মায়ের পক্ষেই—এ চিঠি লেখা সম্ভব নয় নিজের মেয়ের নামে; আমাদের দেশের কোনও মায়ের পক্ষে ভাবাও অসম্ভব।—মধ্যম পাণ্ডব একদমে কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকেন।

ক্যাপ্টেন চৌধুরী বলেন এবার: অতএব—

হ্যাঁ। অতএব, ললিতা ছাড়া আর কে লিখতে পারে এ চিঠি?

কিন্তু ললিতার মোটিভ কি এমন চিঠি লেখার?—জোয়ারে ভেসে যেতে যেতে ঘাসের ডগা হাতড়ান চৌধুরী।

তার বিয়ে হয়ে গেলে সংসার চলবে কি করে, এই ভাবনাই তাকে দিয়ে এই চিঠি লেখায় বারবার।

ওই একই কারণে ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মুখ ভয়ঙ্কর নরখাদকের মুখোস পরে মুহূর্তেঃ আমি যদি বলি আরেকজনেরও লেখবার সম্ভাবনা আছে সে চিঠি—

কার বলুন। পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ ইন্দ্রিয় উদগ্র হয়ে ওঠে একসঙ্গে।

ললিতার দাদার—

নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল সকাল বিনা মেঘে অন্ধকার হয়ে যায়। সূচীভেদ্য অন্ধকার হয় মুহূর্তে।

॥ বারো ॥

সতেরই অঘ্রাণ হতে আর ঠিক তিরিশ দিন আছে।

ললিতাদের বাড়ি থেকে সুরু করে আত্মীয়স্বজন, পরিচিত, অপরিচিত, অফিসের প্রত্যেকটা দেওয়াল পর্যন্ত যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রহর গুনছে। প্রতিটি মুহূর্ত। কেউ মুখে বলছে না সেই অলক্ষনে কথাটাঃ এবারেও শেষ পর্যন্ত চিঠিটা—সেই মারাত্মক উড়ো চিঠিটা ভেঙে দেয় কি না সব। উত্তেজনার মুখে, যারা জানে তাদেরও আসল কথাটাই মাথায় নেই যে এ বিয়ে সাজানো; এর তারিখ একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে হাতছানি। জগদ্ধাত্রী দেবী সকাল-সন্ধ্যে ঠাকুরঘরে পড়ে আছেনঃ মা, এবারে মুখ রেখ। সকলে চোখ রেখেছে সকলকে। এক মুহূর্ত কেউ কাউকে নজর-ছাড়া করছে না। ঘরের বাইরে কোথাও থেকে ফিরে এলে কেউ ঘরের লোকেরা জেরা করছে পুলিসের মতঃ কোথায় গিয়েছিলে? কেন? উত্তর দিচ্ছে যে, সে মিথ্যের চেয়ে সত্য বলা যে কখনও কখনও কত শক্ত এই প্রথম টের পাচ্ছে। প্রশ্নকর্তার সন্দেহ যাচ্ছে না তবুও।

সবচেয়ে ব্যস্ত অবশ্য ক্যাপ্টেন চৌধুরী। এই সাজানো বিয়ের পরিকল্পনা যে প্রথম তাঁর উর্বর মস্তিষ্ক থেকেই প্রসূত কে

বলবে তা তাঁকে দেখে। কেনাকাটা থেকে আরম্ভ করে, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রের মুসাবিদার নকল পর্যন্ত পাঠাচ্ছেন ললিতাদের বাড়িতে, ললিতার বাবার কাছে তাঁর অনুমোদনের জন্যে। শাড়ি, ব্লাউজ থেকে প্রসাধনের প্রতিটি পর্ব ললিতার বউদি নিজের বোনদের দিয়ে সযত্ন নির্বাচনের পর কিনে কিনে পাহাড় করে তুলছেন যখন তখন একদিন সকালে ললিতা এল প্রসন্নতার প্রতিমূর্তির মত স্নিগ্ধতার সুবাসে ভরে দিতে তাঁর সমস্ত পরিশ্রম; সমস্ত প্রয়াসকে। শেভ করছিলেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী। ললিতাকে দেখে খুশীতে নেচে উঠল তাঁর চোখ দুটো: ইয়ং লেডিব বুঝি ঘুম নেই সাতেরই অঘ্রাণের কথা ভেবে?

লজ্জার আর রক্তের রঙ লাল। ললিতা চৌধুরীর বেলা-পড়ে-আসা মুখে লজ্জার রক্তিম আভা ছড়িয়ে গেল যে ক্যাপ্টেন চৌধুরীর দৃষ্টি এড়াল না তা। গোপন করবার চেষ্টাও করল না ললিতা। বরং উল্টে দিলে কথাটা ক্যাপ্টেন চৌধুরীর ওপরই: ঘুম নেই তো দেখছি আপনার! মনে হচ্ছে যেন আপনারই বিয়ে—

আমার? কে বিয়ে করবে এই বৃদ্ধকে?

আয়নায় ম্লান ছায়া চোখে পড়ে ললিতার। সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয় সে: কিন্তু এ কি ব্যাপার?

কোন্ ব্যাপারের কথা বলছ?

এই নিমন্ত্রণ-পত্র; এই কাপড়চোপড় কেনাকাটা—

কেন? বিয়ে হবে তার জন্যে নিমন্ত্রণ-পত্র চাই না? কাপড়-চোপড় ছাড়া বিয়ে হয়? আমি বিয়ে করি নি বটে কিন্তু বিয়ে দেখিও নি নাকি বলতে চাও? এত কিছুই হয় নি এখনও, নেমন্তন্নের চিঠি থেকে সানাই পর্যন্ত কিছুই বাদ যাবে না তোমার বিয়েয়, দেখে নিও তুমি। পান থেকে চুন খসতে দেব না আমি।

কিন্তু বিয়ে তো আমার সত্যি সত্যি হচ্ছে না।

বিয়ে মিথ্যে মিথ্যে হয় নাকি হিন্দুর? অগ্নি সাক্ষী করে, শালগ্রাম শিলা ছুঁয়ে, সাতপাকের বাঁধন তাহলে কি?

আপনি কি বলতে চান যে আপনি ভুলে গেছেন এই বিয়ের আয়োজন করা কেন?

ভুলব? এ তো আমারই আইডিয়া।

তবে?

তবে কি? বিয়ে এবার তোমার ওই তারিখেই হবে।

মানে?

সোজা। সুনির্মল রায়ের সঙ্গে না হয়ে চন্দ্রকান্ত দেবের সঙ্গে হবে, এই যা। পাত্র হিসেবে চন্দ্রকান্ত তোমার অযোগ্য হবে না।

আপনি সিয়েরিয়াসলি বলছেন?

হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট সিয়েরিয়াস আমি; তোমার সন্দেহের কারণ?

আমি বুঝতেই পারছি না।

বিয়ে হবার মুহূর্তে কোনও মেয়েই বুঝতে পারে না কি হতে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

যদি এবারেও সেই চিঠি—

ললিতার মুখের কথা মুখেই রইল, ক্যাপ্টেন চৌধুরী তাঁর জবাব দেবার আগেই ঘরে এসে ঢুকলো ঝড়ের মতো সুনির্মল রায়। ললিতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল আরেক দমকা ঝড়ের হাওয়ার মতোই। হাঁফাতে হাঁফাতে সুনির্মল পকেট থেকে বার করল একটা খাম। রুদ্ধকণ্ঠে প্রায় ক্যাপ্টেন চৌধুরী প্রশ্ন করেন: কি?

একটা চিঠি।—জবাব দেয় সুনির্মল।

তারপর বেরিয়ে যায় যেমন এসেছিল তেমনই স্পিডে—ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে একটি কথা বলার সময় না দিয়েই। যাবার আগে রেখে যায় চিঠিটা ঘরের মাঝখানে বসানো গোল টেবিলটার

ওপরে, কাগজ-চাপা কাচের তলায়। এমন অতর্কিতে ঘটে যায় সমস্তটা যে কিছুক্ষণ ক্যাপ্টেন চৌধুরীর শেভ করবার ক্ষুর তাঁর হাতেই থাকে, গালে লেগে থাকে থোকো থোকো সাবানের ফেনা। সমস্ত পৃথিবীটা দুলে ওঠে পায়ের তলায়; আকাশ চোখের সামনে পার্মানেন্ট ব্ল্যাকের মতো অন্ধকার কালো হয়ে যায় মুহূর্তে। ললিতা যে খুশীর হাওয়া এনেছিল একটু আগে, এখন সে হাওয়া এত বিষাক্ত যে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় ক্যাপ্টেন চৌধুরীর। একটা ইমারৎ—অনেক স্বপ্ন আর অনেকতর সাধনা দিয়ে গড়া একটা সুন্দর ইমারৎ ধ্বসে যায় গৃহপ্রবেশের আগেই। সতেরই অঘ্রাণ ব্যর্থ হয়ে যায় সতেরই কার্তিকের সকালেই।

দশ মিনিট না দশ ঘণ্টা কতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো অচল অনড় বসেছিলেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী, তা নিজেও জানেন না, এবং জানতেনও না যদি ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে এসে না ঢুকতো চন্দ্রকান্ত দেব। ঘরে ঢুকে ওই অবস্থায় ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে বসে থাকতে দেখে ঘাবড়ে গেল চন্দ্রকান্ত। একগাল সাবান-মাখা ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মুখ ভয়াবহ কালবৈশাখীর আসন্ন কালো থমথমে আকাশের মতো গুরুগম্ভীর। কি কথা দিয়ে কথা আরম্ভ করবে ভেবে পায় না চন্দ্রকান্ত অনেকক্ষণ। তারপর বলে: কি ব্যাপার? কোনও দুঃসংবাদ?

ওই দেখো, সেই চিঠি! আমার সব কল্পনা, তোমাদের সব চেষ্টা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল!

খামটা চন্দ্রকান্ত তুলে নিয়ে খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বার করবার চেষ্টা করছে দেখেই ক্যাপ্টেন চৌধুরী আবার বলেন: আর ওই আনলাকি নোংরা চিঠি দেখ না; ওর প্রতিটি শব্দ তো আমাদের জানা—

ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে থামিয়ে দিয়ে চীৎকার করে ওঠে চন্দ্রকান্ত: দিনদুপুরে ভূত দেখছেন আপনি? কার চিঠি দেখুন—

সুনির্মল রায়ের লেখা চিঠিটা নাকের ওপর ছুঁড়ে দেয় চন্দ্রকান্ত। ক্যাপ্টেন চৌধুরীর বুক নতুন সম্ভাবনায় নতুনতর আশঙ্কায় আওয়াজ করে ওঠে। চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করেন তিনি।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ক্যাপ্টেন চৌধুরী,

এ চিঠি পেয়ে আপনি চমকে যাবেন আমি জানি। তবুও এ চিঠি না লিখে আমার উপায় ছিল না। আপনার নির্দেশ মতো সাজানো বিয়ের বরের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে এখন আমার ললিতাকে বিবাহ না করে আর উপায় নেই। উড়ো চিঠি না এলে ললিতা আমার ; উড়ো চিঠি এলেও তাই জানবেন।

সুনির্মল

হতভাগা! সস্নেহ হাস্যে ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী। মেঘ ফেটে আবার বেরিয়ে পড়ল সকালবেলার শিশু সূর্য।

সত্যি সত্যি বিপদে ফেললো সুনির্মল। যে উড়ো চিঠি এতদিন বিপন্ন করেছিল ললিতার পরিবারকে, এখন সেই উড়ো চিঠি না এসে সাংঘাতিক ফল্‌স্ পজিসানে ফেলল ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে এই বুড়ো বয়সে। সতেরই অগ্রাণের আর কত দেরী? দিন পনেরও নয় কড়াক্রান্তি হিসেব করে গুনলে সময়। যদি চিঠি না আসে তাহলে বিয়ের দিন মুখ দেখাবেন কি করে তিনি! যে বিয়ে হবে না, যে বিয়ে সাজানো, সে বিয়ে যার জন্যে আসল বিয়ের যোগাড়-যন্তরের চেয়েও যত্নে আর সতর্কতায় গড়ে তুলতে হচ্ছে নিপুণ নিখুঁত অভিনয়ের অনবদ্যতায় সেই উড়ো চিঠিই যদি না আসে তাহলে? তাহলে বিয়ের পিঁড়ি শূন্য রাখেন কি করে ক্যাপ্টেন চৌধুরী? কি করে বলবেন তখন ললিতার বাবাকে, ললিতার মাকে যে এ বিয়ে বিয়ে নয়! চোর ধরবার জন্যে পুলিসের কল মাত্র।

যে-কল ইঁদুর ধরবার জন্যে পাতা, সেই কলে ক্যাপ্টেন চৌধুরীই পড়েছেন।

যদি উড়ো চিঠি আসে তাহলে তো বটেই, যদি উড়ো চিঠি না আসে তাহলেও ললিতা তার বলে ভয় দেখিয়েছে সুনির্মল। কিন্তু ললিতাকে পাওয়া উচিত চন্দ্রকান্তর। চন্দ্রকান্ত দেবের। পিতার প্রত্যাখ্যানের পরেও, সে বলেছিল সুনির্মলকে অনেক আগেই যে সে ললিতাকে উড়ো চিঠি সত্ত্বেও বিয়ে করবে। সূর্যকান্ত দেবের মত পরিবর্তনের জন্যেও তার অপেক্ষা কোনওদিন শেষ হবার নয়।

আকাশপাতাল ভেবে কূলকিনারা খুঁজে পান না জীবনে এই প্রথম সন্ধ্যার অন্ধকার নামার পরও পেগ স্পর্শ না করা ক্যাপ্টেন চৌধুরী।

অনিমেষ হাজরা অনেকক্ষণ বসেছিল চুপ করে সামনের চেয়ারে। ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে কালো মুখ করে বসে থাকতে দেখলে অনিমেষের দারুণ কষ্ট হয়। মনে হয় প্রজাপতিকে কেউ সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছে। সে ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে চাঙ্গা করবার জন্যেই নিস্তব্ধতার বরফ ভাঙল প্রয়োজনের অতিরিক্ত আওয়াজ করে: কি হয়েছে আপনার?

ক্যাপ্টেন চৌধুরী নিদারুণ নিরুৎসাহের কণ্ঠে বললেন কোনও রকমে: ভাবছি।

কি ভাবছেন বলতে বাধা আছে?

ভাবছি সেই উড়ো চিঠি এখনও আসছে না কেন?

হেসে ফেলল অনিমেষ হাজরা: সে চিঠি এলেও ভাবনা, না এলেও ভাবনা, তাকেই কি দিল্লিকা লাড্ডু বলে?

না হে, সত্যি ভাববার কথা যদি সেই চিঠি না আসে।

কেন?

তাহলে সতেরোই অঘ্রাণে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে কে?

সুনির্মল, আপনার নির্বাচিত প্রার্থী।

চন্দ্রকান্ত কি দোষ করল ?

সুনির্মলের নাম যে কার্ডে ছাপা হয়ে গেছে বর বলে।

সত্যিই তো! এদিকটা একবারও ক্যাপ্টেন চৌধুরীর মাথায় আসে নি। সুনির্মলের নাম তার পূর্বপুরুষের ধাম সুদ্ধ জ্বলজ্বল করছে নিমন্ত্রণপত্রে।

ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে আরও মুষড়ে পড়তে দেখে ঘরের আবহাওয়াকে হালকা করবার জন্যেই শুধু অনিমেষ হাজরা আবার লঘুস্বর হয়ঃ বলেন তো আমিই একটা উড়ো চিঠি দিই, আপনার মুশকিল আসান হবে তাতে ?

না।

কেন ?

কারণ সুনির্মল উড়ো চিঠি পেলেও ললিতাকে বিয়ে করবে, না পেলেও বিয়ে করবে বলে ভয় দেখিয়েছে।

ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে ভয় দেখাবে তারই হাতের পুতুল !

হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে যে!

কাদায় পড়লে তবে তো ?

বেকায়দায় পড়তামই না, যদি—

যদি কি ?

যদি তুমি বিয়ে করতে ললিতাকে তাহলে এসব হাঙ্গামা কিছু হতই না; তোমাকে তো আর ললিতা সম্পর্কে উড়ো চিঠি দিয়ে বিয়ে ভাঙাতে পারত না।

কিন্তু আমাদের কারুরই কাউকে বিয়ে করবার উপায় নেই।

কেন ?

কারণ ওর আর আমার দুজনের গোটা পরিবারটাই আমাদের ওপর নির্ভর করছে।

বিয়ের পরেও তো সে ব্যবস্থা চালু রাখা চলত।

কি রকম ?

ওর মাইনে যেত ওর সংসারে, তোমার মাইনেয় যেমন চলছিল তোমার বাড়ি এতদিন—

ক্যাপ্টেন চৌধুরীকে থামিয়ে দেয় অনিমেষ হাজরা : বিয়ে তো করেন নি তাই জলের মত বুঝিয়ে দিচ্ছেন ফরমুলা।

কেন, ভুল বললাম ?

নিশ্চয়ই !

কোনটা ভুল ?

সবটাই।

কি রকম ?

বিয়ের পর বাড়ির বউকে চাকরি করতে দেবে না প্রথমত আমার বাড়িতে, দ্বিতীয়ত বউ চাকরি করলে তার মাইনে বাপের বাড়ি যেতে পাবে না এক পয়সাও, কারণ বিয়ের পর বাংলাদেশের মেয়ে আবার বাপের কে ? তার সঙ্গে সম্পর্ক তো নমাসে-ছমাসে একবার দেখাসাক্ষাৎ মাত্র।

কিন্তু তার জন্যে তুমি বিয়ে করবে অন্য মেয়েকে, এবং ললিতা বিয়ে করতে পারে না তোমাকে ?

এ যুগে প্রায় সকলের বেদনাই তো এই, আমি তার ব্যতিক্রম হব কেন ?

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে দিয়ে প্রণাম করছেন ললিতার মা জগদ্ধাত্রী দেবী : মুখ রেখো গৃহদেবতা। এবারে যেন অভিশপ্ত সেই চিঠিতে ভেঙে না যায় বিয়ে।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে ললিতার বাবার ঘরে এলেন জগদ্ধাত্রী দেবী। স্বামীকে বললেন : ঠাকুরকে বলছি কেবলই, যেন এবারে ললিতার বিয়েতে কোনও বাধা না পড়ে।

চিন্তাহরণ—ললিতার বাবা—ললিতার মাকে জবাব দেন : এবার ঠাকুর তোমার কথা রাখবেন।

বলছ ?—ললিতার মায়ের চোখে সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো জ্বলে ওঠে দ্বিগুণতর দীপ্তিতে।

হ্যাঁ, বলছি যে তার কারণ আছে।

কি কারণ ?

যে প্রতিবার এই বিয়ে ভেঙেছে উড়ো চিঠি দিয়ে—

চিন্তাহরণকে থামিয়ে দিয়ে জগদ্ধাত্রী চেঁচিয়ে ওঠেন : তুমি তাকে জান ?

বরাবরই জানতাম।

তুমি কি মানুষ ? নিজের মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিচ্ছে একজন জেনেও—

চুপ করে বসে আছি—এই তো ?

জগদ্ধাত্রী দেবী চোখে আঁচল চাপা দেন।

চিন্তাহরণ একটু চুপ করে থেকে বললেন : এবার এতদিনেও যখন চিঠি যায় নি পাত্রপক্ষের কাছে, তখনই আমি খবর করেছি অবিনাশের। অবিনাশ মৃত্যুশয্যায়।

অবিনাশ লিখত এই চিঠি ?

হ্যাঁ, কেন তোমার বিশ্বাস হয় না ? অবিনাশের কথা একদিন আমিই তোমাকে বলেছি।

কিন্তু ললিতার শরীরের যেসব চিহ্নের কথা চিঠিতে লিখেছে তা অবিনাশ জানবে কি করে ?

সে চিহ্ন তার শরীরে আছে কিনা কোনওবার পাত্রপক্ষ তা মেলাতে গেছে ? চিঠি পেয়েই ধরে নিয়েছে এত কথা যে চিঠিতে লিখছে সে নিশ্চয়ই ললিতাকে জানে।

কিন্তু ?

কিন্তু কি ?

আমি তো জানি সে চিহ্ন মিথ্যে নয়।

তাহলে অবিনাশ যখন প্রথম এ বাড়িতে আসে তখন ললিতা তো খুব ছোট, হয়তো—

সে তখন এত ছোট নয় যে ওই চিহ্ন অবিনাশের চোখে পড়ার কথা—

তুমি কি বলতে চাইছ?

আমি বলতে চাইছি অবিনাশ নয়, এ চিঠির লেখক আমাদের ঘরের লোক।

চিন্তাহরণের বুক ধ্বক করে ওঠে, মুখ শুকিয়ে যায়। কোনও রকমে জিজ্ঞেস করেন: ঘরের লোক? তুমি বলছ কি?

ঠিকই বলছি, এ চিঠি যে লিখেছে সে একজন মেয়ে।

মেয়ে?

হ্যাঁ, এবং আমাদের ঘরেরই লোক—বউমা!

ললিতার বউদি, বাপের বাড়িতে চিঠি লেখবার কাগজ কলম দোয়াত কিছুই খুঁজে না পেয়ে ললিতার দাদাকে জিজ্ঞেস করল: কলম, কাগজ কিছু নেই কেন? কোথায় গেল?

সব বন্ধ করে রেখেছি বাক্সয়। কেন?

চিঠি লিখব।

কাকে?

আপত্তিজনক কাউকে নয়। মাকে।

কয়েকদিন পরে লিখবে, এখন নয়।

কেন?

কারণ তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

কি ব্যাপারে বিশ্বাস কর না?

উড়ো চিঠির ব্যাপারে।

এ চিঠি আমি দিচ্ছি বলে তোমার ধারণা?

বরাবর—

আমার হাতের লেখা ধরা পড়ত না ?

পড়ত যদি নিজের হাতে লিখতে। অত বোকা তুমি নও।

তাহলে আর কাগজ-কলম আমার হাতে দিতে তোমার ভয় কেন ?

তুমি যাকে দিয়ে এই চিঠি লেখাও তাকেই চিঠি লিখতে চাইছ এই জন্যে—

বেশ, আমি যা লিখছি, তা তুমি পড়ে দেখে নিজের হাতে ফেলে দাও।

প্রতিবারই তাই ফেলেছি।

তবুও অবিশ্বাস ?

হ্যাঁ।

কেন ?

কারণ ওর মধ্যেই কোনও সংকেত থাকে, যার অর্থ আমার ধরবার সাধ্যি নেই।

ওর বিয়ে ভাঙায় আমার স্বার্থ কি ?

আমাদের সকলের যা স্বার্থ।

অর্থাৎ ?

ন্যাকামি করো না, ওর মাইনের টাকায় সংসার চলে, বিয়ে হয়ে গেলে ভাত জুটবে না।

সে তো তোমারও স্বার্থ।

হ্যাঁ। কিন্তু আমি পুরুষ, আমার কাছে আমার বোনের জীবন অনেক বড়। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি ?

ওর শরীরের যে চিহ্নের কথা চিঠিতে সে এ বাড়ির মেয়ে ছাড়া কারুর জানার কথা নয়।

এ বাড়িতে আমি ছাড়াও তো মেয়ে আছে,—মা।

বাঘের মতো নেকড়ের ওপর বউয়ের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে

ললিতার দাদা। টিপে ধরে কণ্ঠনালি। চোখ বেরিয়ে আসে বউয়ের। মরেই যেত একটু বাদে বউটা। ললিতা এসে পড়ে ছাড়িয়ে দেয় কখন তার দাদাকে, উঠে পড়ে ললিতার দাদা। বলে : যা বেটি, বেঁচে গেলি। আর একদিন ওই নাম মুখে আনবি তো ললিও বাঁচাতে পারবে না তোকে।

ললিতা বউদির চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেয়। হাওয়া করতে বসে।

পঞ্চপাণ্ডব নিশ্চিন্ত হয়েছে—এ চিঠির লেখক, এই উড়ো চিঠির লেখক, সুনির্মলই। এই-ই বিয়ে করতে চেয়েছিল আসলে ললিতাকে বরাবর, ললিতাও একেই চেয়েছে স্বামী হিসেবে। এই সিদ্ধান্তে প্রথম উপনীত মধ্যম পাণ্ডব বলছিলেন ঃ সুনির্মলের বেলাতেই প্রথম উড়ো চিঠি এলো না কেন ?

সে চিঠি আসার সময় তো এখনও পেরিয়ে যায় নি। কনিষ্ঠ পাণ্ডব স্কেপটিক কমেণ্ট করেন।

এলে এতদিনে আসত, তার সময় কোথায় আর ?

তিন দিনেরও বেশী আছে এখন, পুরো বাহাত্তরের ওপর আরও কয়েক ঘণ্টা এক্স্ট্রা।

বিয়ে ভেঙে দেবার জন্যে যে চিঠি, সে এত দেরী করবে কেন ?

করবে এই জন্যে যে, এবার পাকা দেখা বিয়ের দিন সকালে।

তাতে কি হলো ?

তাতে এই হল যে সেইদিন সকালে চিঠি আসবে।

না।

কেন ?

কারণ, এবারে বিয়ের পাত্র যে, সেই-ই এতদিন চিঠি দিয়েছে।

প্রমাণ ?

আগেই দিয়েছি,—সুনির্মল উড়ো চিঠি দিয়ে দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করেছে এতদিনে।

এ তো প্রমাণ নয়, এ তো অনুমান মাত্র।

অনুমানও একরকমের প্রমাণ ছাড়া কি ?

কিন্তু এই সুনির্মলের নাম তো ললিতা অথবা আর কারুর মুখে আমরা কখনও শুনিনি।

শুনিনি বলেই তো ওর সুবিধে হয়েছে, ওকে কেউ সন্দেহ করেনি।

কিন্তু ললিতা ওকে বিয়ে করতে আদৌ রাজি হবে যে তা ও জানবে কি করে ?

আন্দাজ করবে এই কারণে যে আর কেউ ললিতাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না যে ওই উড়ো চিঠির পর তা সুনির্মল জানে বলেই।

আমরা রাজি হব কেন ?

নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল, এই রীতি অনুযায়ী আমাদেরও রাজি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি ?

কিন্তু জেনেশুনে একজন এই নোংরা চিঠি লিখেছে, তারপরেও তার সঙ্গে ললিতার বিবাহ দেওয়া কি ঠিক হবে ?

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব বরাবর যেমন, এবারেও তেমনই ওস্তাদের খেলা শেষ রাতে এই থিয়োরি অনুসরণ করে মোক্ষম কথাটি বলেন এতক্ষণে : সুনির্মল ওই চিঠিতে শরীরের যে চিহ্নের উল্লেখ আছে তা জানবে কি করে ?

তিন পাণ্ডব একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ে মধ্যম পাণ্ডবের ওপর : হ্যাঁ, কি করে জানবে সে কথা ?

এক মুহূর্তের জন্যে বুঝি ঈষৎ ম্লান হয়ে যায় মধ্যম পাণ্ডবের মুখ। তারপরেই নিবে যাবার আগে শেষবারের মতো জ্বলে ওঠে দারুণ আলো করা সলতের অনুরূপ উজ্জ্বল দীপ্তিতে। ললিতার

শরীরে ওই চিহ্ন আছে কি নেই, এ খবর কোন পাত্রপক্ষই কোনও দিন মেলাতে যাবে না, এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই সুনির্মল সেই কুৎসিত পত্রের ঢিল অন্ধকারে ছুঁড়েছে এবং প্রত্যেকবারই তার ঢিল লক্ষ্যবিদ্ধ করেছে যে তার প্রমাণ কেবল সুনির্মল নয়, আমরাও পেয়েছি।

তিন পাণ্ডব জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে তাকান যে-কোনও বিপদে পাণ্ডবরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে অসহায় তাকাত।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব নিরুত্তেজ কণ্ঠের বরফ-জল ঢেলে দেন মধ্যম পাণ্ডবের জ্বালা-বিতর্কের আগুনে: ললির মা আমাকে বলেছেন উড়ো চিঠিতে উল্লিখিত চিহ্ন ললির শরীরের যেখানে আছে বলে চিঠিতে লেখা আছে, তা সত্য। হুবহু ওই দাগ ওই জায়গাতেই আছে—

মধ্যমালোকিত প্রদীপ নিবে যায় ঝোড়ো একটা হাওয়ার সব চেয়ে বড় এক থাবড়ায়। এক মুহূর্তে।

সূর্যকান্ত মৃত্যুশয্যায় ডেকে পাঠিয়েছেন চন্দ্রকান্ত দেবকে। হতাশ অন্ধকার ঘরে পা দিলেই বোঝা যায় শেষের দিন অন্তিম মুহূর্ত গুণছে সূর্যকান্তের। মৃদু আলো, ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা, কখনও কখনও দুর্ধর্ষ সূর্যকান্তর চেষ্টা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যন্ত্রণায় উচ্চারিত স্বগতোক্তি—সব মিলিয়ে সেঘরে বেশীক্ষণ থাকা যে-কোনও দুঃসাহসীর পক্ষেও দুর্মর অভিজ্ঞতা।

বাবা, ডেকেছিলেন? মোমের আলোর মত নরম গলা চন্দ্রকান্তর।

হ্যাঁ। শোনো, আমি আর কয়েকদিন—

কেন, ডাক্তার তো বলেছে যে আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।

ডাক্তারের কথা নয় এটা, ফি-এর বদলে মিথ্যে সান্ত্বনা। ক্যান্সার হলে কেউ বাঁচে না।

আপনার যন্ত্রণা তো একটু কম।

ক্যান্সারের যন্ত্রণা কম, বিবেকের যন্ত্রণাই দুঃসহ, সে যাক। তুমি ওই মেয়েটাকেই বিয়ে করছ তো?

না।

কেন?

ওর সঙ্গে সুনির্মল বলে একটি ছেলের বিয়ে হচ্ছে এ মাসের সতেরই।

এ মাসের আজ কত?

পনেরই অঘ্রাণ আজ।

তুমি যে কথা দিয়েছিলে ওকে বিয়ে করবে আমার অনুমতি পেলে?

অনুমতি পেতে দেরী হয়ে গেল বাবা।

উড়ো চিঠির রহস্যের কোনও কিনারা হলো?

না। এবারে এখনও উড়ো চিঠি আসেনি। তাছাড়া, উড়ো চিঠি এলেও সুনির্মল তাকে বিয়ে করবেই।

উড়ো চিঠি আসবে বলে মনে হয়?

না।

কেন?

কারণ আমার সঙ্গে ললিতার যাতে বিবাহ না হয় তার জন্যেই এই উড়ো চিঠি এসেছিল আপনার কাছে।

কিন্তু আমার কাছেই নয় শুধু, আমি তো শুনেছি ওই মেয়েটির এর আগে যতবার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে, ততবারই এসেছে উড়ো চিঠি।

হ্যাঁ, তা এসেছে।

তাহলে?

প্রত্যেকবারই যার সঙ্গে ললিতার বিয়ে হবো হবো হয়েছে তার

সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি আছে এমন কেউই এ উড়ো চিঠির লেখক হবে নিশ্চয়ই।

এবং সে-ই ললিতার পাণিপ্রার্থী ?

তা বলতে পারি না।

খুব বলতে পার, বলছ না ইচ্ছে করে। এবারে যদি উড়ো চিঠি না আসে তাহলে বুঝতে হবে, সুনির্মলই সেই সাংঘাতিক চিঠির বেনামী লেখক, এই তো ?

না। হয়তো সুনির্মলের সঙ্গে বিয়েতে তার আপত্তি নেই।

কেন নেই ?

তা কি করে বলব ? তাহলে তো আমার নিজেকেই উড়ো চিঠির লেখক ঠাওরাতে হয়।

সূর্যকান্ত কথা খুঁজে পান না কিছুক্ষণ। যখন খুঁজে পান তখন কিছু বলবার আগেই চাকর রঘুবীর এসে ঘরে ঢুকে বলে, বাবু আয়া এক।

কেয়া নাম ?

সুনিরমাল—

চাকরের কথা শেষ হয়নি, সূর্যকান্ত বলেন : ইধার ভেজো।

সুনির্মল ঘরে ঢোকে ধ্বসে যাওয়া চোখমুখ নিয়ে, যেন ঝড় বয়ে গেছে তার মনের ওপর দিয়ে ; শরীরের ওপর রেখে গেছে ধ্বংসের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

কী ব্যাপার ?

দারুণ খারাপ খবর, চন্দ্রকান্তবাবু—

কী হয়েছে ?

ললিতার বাবা আজ ভোরে আত্মহত্যা করেছেন।

চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে যায় সুনির্মলের সঙ্গে। সূর্যকান্তর কথা বলা হয় না, যেকথা বলবার জন্যে তৈরী ছিলেন তিনি।

মুখ গোল করে উদিত পূর্ণচন্দ্রের হাসির বাঁধ ভাঙা আকাশে উপছে পড়েছিল আলো। পেছনের বাড়ির বাগান থেকে কামিনী-ফুলের তীব্র মাতাল গন্ধ ভেসে আসছিল অনেকক্ষণ থেকে। অনেকক্ষণ থেকেই বারান্দায় রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়েছিল ললিতা। ঘুম আসছিল না আজ রাতে তার ; কিছুতেই ঘুম আসছিল না। না। ঘুম আসছিল। আসতে আসতেই চোখের পাতা খুলে যাচ্ছিল আবার। ছ্যাঁৎ করে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল বার বার। সাংঘাতিক আতঙ্কে নিদ্রা বিভীষিকা হয়ে দেখা দিয়েছিল আজ রাতে ললিতার চোখে। অনেকদিন—অনেকদিন বাদে এরকম ভয়ের, এরকম ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চিত একটি রাত পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে ভয়ঙ্করতর কোনও দুর্ঘটনার দূত হয়ে। ললিতা বরাবর লক্ষ্য করেছে, এরকম অকারণ আশঙ্কায় মন ভারী হয়ে উঠলে, তারপর, অব্যবহিত পর পরই কোনও সাংঘাতিক দুঃসংবাদ মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যের পাখায় ভর করে, অন্ধকার করে স্বাভাবিক সচ্ছন্দ আকাশে আসে কালবৈশাখী। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তছনছ করে দিয়ে যায় সব ব্যবস্থা, বানচাল করে জীবনযাত্রা, তারপর কোথায় আবার অন্য কোন্ ঘর ভাঙতে চলে যায় কেউ জানে না।

ললিতা আরও জানে তার অভিজ্ঞতা থেকে। বরাবর জেনেছে, খুব বড় অসুখ চলেছে তার বাড়িতে, তখন যদি তার মন ছমছম করে না থাকে, তাহলে সে জেনেছে, ডাক্তার যাই বলুক, এ যাত্রা কোনও বিপদ নেই। আবার অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ খবরে, মন চঞ্চল হলে বুঝেছে, ঝড় উঠবে। উঠেছেও সেই ঝড় প্রতি বার। সেই দুঃখকর অভিজ্ঞতার অশ্রুজলের আয়নায় আজ সে আবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এ-বাড়ির আঙিনায় এসে দাঁড়াল বলে কোন ভগ্নদূত। অজানা বিপদের এমন কোনও মারাত্মক বিপদের বার্তা নিয়ে সে আসছে যে কোথাও সামান্য একটু শব্দ হলে ভয়ে ললিতার বুকের

মধ্যে হাতুড়ির আঘাত পড়তে থাকে যেন। টিপ টিপ করতে থাকে। মনে হয় আর পারছে না সে; আর পারবে না বহন করতে প্রতি মুহূর্তে অজানা আশঙ্কার জানা পদক্ষেপ কান পেতে শুনতে।

একবার ভেবেছিল উড়ো চিঠির আশঙ্কাই আজ প্রবলতম আঘাত করতে উদ্যত সময় পেরিয়ে যাবার সময় যখন প্রায় এসে পৌঁছেছে জীবনের দরজায়। কিন্তু উড়ো চিঠি আর আসবে কখন। কাল ভোর থেকে সানাই বসবে বাড়ির দরজায়। আর একবার মনে হয়, উড়ো চিঠি না আসাই বোধ হয় এমন ব্যাকুল করে তুলেছে তাকে। ঘড়ির কাঁটা ধরে দীর্ঘকাল জ্বর এসেছে যার গায়ে, একদিন হঠাৎ অ্যাবসেন্ট হলে সেই পালা জ্বর যেমন অসহায় বোধ করে, আশ্বস্ত হবার চেয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করে অনেক বেশি অসুস্থ ব্যক্তি, তেমনই এবারে উড়ো চিঠি আসবার সময় চলে যাবার পর থেকেই ললিতার মনে হয়, উড়ো চিঠির চেয়েও ভয়াবহ কোনও আঘাত আসছে বিলম্বিত কিন্তু সুনিশ্চিত লয়ে।

চিন্তায় ছেদ পড়ল ললিতার। চায়ের জল চাপিয়েছিল। দু কাপ চায়ের এক কাপ বাবার, আরেক পেয়ালা নিজের জন্যে। প্রত্যেক দিনই তার দিন শুরু হয় এই এক অভ্যাসের অবশ্যম্ভাবী পৌনঃ-পুনিকতায়। চায়ের জল উনুন থেকে নামাতে যাবার সময় তার হঠাৎ মনে হলো, আর হাসি পেলো ললিতার তাই ভেবে, বিয়ে হয়ে গেলে এত ভোরে রোজ বাবাকে চা করে দেবে কে? বউদি ওঠে সকাল আটটায়। তাছাড়াও বৌদির চা, প্রথম চা দিনের মুখে দিতে চাইবেন না বাবা, মুখে দিলেও মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই। বাবার জন্যে চা এ বাড়িতে এক ললিতার হাতেই ঠিক ঠিক তৈরী হয়। বাবার জন্যে বউদি চা করলে সে চা বিষ হতে বাধ্য। বউদির মনে এবাড়ির কারুর জন্যে বিষ ছাড়া আর কিছুই দেবার নেই।

চা হাতে করে বাবার ঘরে ঢুকলো ললিতা। বাবা নেই বিছানায়। চা-টা টেবলে রেখে চেয়ারে বসল সে। ঘরে আলো জ্বালা। পাখা ঘুরছে। পাখার হাওয়ায় ঘরময় ঘুরছে একটা পাতলা কাগজ। ললিতার নাকের সামনে কাগজটা আসতেই ছেলেমানুষের মতো খপ করে কাগজটা ধরে ফেললো সে। কাগজটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল সেই কটি কথা ঃ

ললিতা বলে যে মেয়েটির সঙ্গে আপনার পুত্রের বিবাহ পাকা করতে চলেছেন সে মেয়েটি সদ্বংশজাত কিন্তু সৎ নয়। যদি আমার বক্তব্যে সন্দিহান হন তাহলে বলি—

হাতের লেখা ললিতার বাবা চিন্তাহরণের।

ললিতা চিঠিতে চোখ দিয়েই চীৎকার করে উঠলো ঃ বাবা তুমি!

সে ডাক চিন্তাহরণের কানে গেল না। কানে গেল ললিতার দাদার। সেও চীৎকার করে উঠেছে তখন কলঘরে যেতে গিয়ে, বাবা!

চিন্তাহরণের জিব আর চোখ বেরিয়ে আসা শরীরটা স্নানের ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে।

সমাপ্ত